বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ

(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

ডেথ রেফারেন্স নং-১১৬/২০১৭

রাষ্ট্র .....আপীলকারী

-বনাম-

ওয়াসিম আক্তার ওরফে তারেক হুসাইন ওরফে তারেক ওরফে মারফত আলী গং

..... রেসপনডেন্ট

জনাব এ.এম. আমিন উদ্দিন, এর্টনী জেনারেল সঙ্গে

জনাব এস. এম. মুনীর, অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল

জনাব শেখ মোহাম্মদ মোরশেদ, অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল

জনাব মোহাম্মদ মেহেদী হাসান চৌধুরী, অতিরিক্ত এটর্নী জেনারেল

জনাব শ্রী বিশ্বজিৎ দেবনাথ, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল

জনাব ডঃ মোঃ বশির উল্লাহ, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল

জনাবা ইয়াসমিন বেগম (বিথী), ডেপুটি এটর্নী জেনারেল

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান শাহিন, সহকারী এটর্নী জেনারেল

জনাব মুহাম্মদ শাহীন মীরধা, সহকারী এটর্নী জেনারেল

জনাব মোঃ সাফায়েত জামিল, সহকারী এটর্নী জেনারেল

জনাব আশিকুজ্জামান বাবলু, সহকারী এটর্নী জেনারেল

জনাবা সৈয়দা জাহিদা সুলতানা (রত্না), সহকারী এটর্নী জেনারেল এবং

জনাব সায়েম মোহাম্মদ মুরাদ, সহকারী এটর্নী জেনারেল

.....রাষ্ট্র পক্ষে

জনাব অমুল্য কুমার সরকার, এ্যাডভোকেট

.....আসামী পক্ষে ষ্টেট ডিফেন্স আইনজীবী

সঙ্গে

ফৌজদারী আপীল নং-১০০১৭/২০১৭

(জেল আপীল নং- ৩৯৫/২০১৭, ৩৯৬/২০১৭, ৩৯৭/২০১৭ এবং ৩৯৯/২০১৭ হইতে উদ্ভুত),

মোঃ রাশেদ ড্রাইভার ওরফে আবুল কালাম ওরফে রাশেদুজ্জামান খান ওরফে সাইমন খান গং .... আপীলকারী

-বনাম-

রাষ্ট্র ..... রেসপনডেন্ট

জনাব মোহাম্মদ আহসান, এ্যাডভোকেট সঙ্গে

জনাব এমাদুল হক, এ্যাডভোকেট .....আপীলকারী পক্ষে

ফৌজদারী আপীল নং-১০০৬৯/২০১৭

(জেল আপীল নং-৩৯৮/২০১৭ হইতে উদ্ভুত),
শেখ ফরিদ ওরফে মাওলানা শওকত ওসমান
..... আপীলকারী
-বনাম-
রাষ্ট্র ..... রেসপনডেন্ট
জনাব এস. এম. শাহজাহান, এ্যাডভোকেট সঙ্গে
জনাব এইচ. এ. মাহমুদ সুমন, এ্যাডভোকেট.....আপীলকারী পক্ষে

ফৌজদারী আপীল নং-১০১৩৮/২০১৭

মোঃ আনিসুল ইসলাম ওরফে আনিছ গং ..... আপীলকারী
-বনাম-
রাষ্ট্র ..... রেসপনডেন্ট
জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন, এ্যাডভোকেট .....আপীলকারী পক্ষে

ফৌজদারী আপীল নং-৫২২৫/২০১৮

(জেল আপীল নং-৩৬৫/২০১৭ হইতে উদ্ভুত),
মৌলানা আব্দুর রউফ ওরফে মুফতি আব্দুল রউফ ওরফে আব্দুল রাজ্জাক ওরফে আবু ওমর ..... আপীলকারী
-বনাম-
রাষ্ট্র ..... রেসপনডেন্ট
জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন, এ্যাডভোকেট.....আপীলকারী পক্ষে

এবং

জেল আপীল নং-৪০০/২০১৭

মুন্সি মহিবুল্লাহ ওরফে মফিজুর রহমান ওরফে মফিজ
..... আপীলকারী
-বনাম-
রাষ্ট্র ..... রেসপনডেন্ট
জনাব অমুল্য কুমার সরকার, এ্যাডভোকেট
.....আসামী পক্ষে ষ্টেট ডিফেন্স আইনজীবী

উপস্থিতঃ
জনাব বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন
এবং
জনাব বিচারপতি মোঃ বদরুজ্জামান

রায় প্রদানের তারিখ-১৭/০২/২০২১

বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেন ঃ

ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নং-২ এর বিজ্ঞ বিচারক দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৫/২০১০ তে গত ২০.০৮.২০১৭ ইং তারিখের রায় ও আদেশে অত্র মামলার

১০ জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ড এবং আরও ৪ জন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে বিভিন্ন মেয়াদে দন্ডিত করেন। এর ফলে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩০(২) ধারা অনুযায়ী মৃত্যুদন্ড অনুমোদনের জন্য উপরোক্ত ডেথ রেফারেন্সটি হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী ১। মো: ইউসুফ ওরফে মোসহাব মোড়ল ওরফে আবু মুসা হারুন ২। হাফেজ জাহাঙ্গীর আলম বদর ৩। মুফ্তি শফিকুর রহমান এবং ৪। মুফ্তি আব্দুল হাই পলাতক থাকায় তাদের পক্ষে কোন আপীল করা হয়নি।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী ১। ওয়াসিম আক্তার ওরফে তারেক ওরফে মারফত আলী জেল আপীল নং-৩৯৬/২০১৭, ২। মো: রাশেদ ড্রাইভার ওরফে আবুল কালাম ওরফে রাশেদুজ্জামান খান ওরফে শিমন জেল আপীল নং-৩৯৫/২০১৭, ৩। মাওলানা আবু বকর ওরফে হাফেজ সেলিম হাওলাদার জেল আপীল নং-৩৯৯/২০১৭ এবং ৪। হাফেজ মা: ইয়াহিয়া জেল আপীল নং-৩৯৭/২০১৭ দায়ের করেন। উক্ত ৪ জন মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী যৌথভাবে ফৌজদারী আপীল নং-১০০১৭/২০১৭ দায়ের করেন। অপর মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী শেখ ফরিদ ওরফে মাওলানা শওকত ওসমান জেল আপীল নং-৩৯৮/২০১৭ এবং ফৌজদারী আপীল নং ১০০৬৯/২০১৭ দায়ের করে এবং মাওলানা আব্দুর রউফ ওরফে মুফ্তি আব্দুর রউফ ওরফে আব্দুর রাজ্জাক ওরফে আবু ওমর ফৌজদারী আপীল নং-৫২২৫/২০১৮ দায়ের করে-যা জেল আপীল নং-৩৬৫/২০১৭ থেকে উদ্ভূত। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামী মেহেদি হাসান ওরফে আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মেহেদি হোসেন ওরফে গাজী খান কোন ফৌজদারী আপীল দায়ের করেছে মর্মে নথিতে উল্লেখ নেই। ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামী মো: আনিসুল ইসলাম ওরফে আনিস এবং সারোয়ার হোসেনদ্বয় ফৌজদারী আপীল নং ১০১৩৮/২০১৭ দায়ের করে এবং ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডপ্রাপ্ত অপর আসামী মো: মহিবুল্লা ওরফে মফিজুর রহমান ওরফে মফিজ জেল আপীল নং-৪০০/২০১৭ দায়ের করে।

উপরোক্ত ডেথ রেফারেন্স এবং সকল ফৌজদারী আপীল এবং জেল আপীল গুলো একত্রে বিভিন্ন তারিখে শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং কার্যের সুবিধার্থে একক রায়ের মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি করা হলো।

অত্র মামলার এজাহারকারীর অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপ:

গত ২২.০৭.২০০০ ইং তারিখে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানাধীন শেখ লুৎফুর রহমান

সরকারী কলেজ মাঠ প্রাঙ্গনে জনসভার প্যান্ডেল প্রস্তুতকালীন গত ২০.০৭.২০০০ ইং তারিখ সকাল ৮:০০ ঘটিকার সময় সেখানে কর্তব্যরত কং/২০০ স্বপন ঘোষ এবং কং/২৯২ অলিয়র রহমান এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান কামাল হোসেনের টেলিফোনের মাধ্যমে কোটালীপাড়া থানা থেকে অনুমান ২ কিলোমিটার দক্ষিণ কোণে কমিউনিটি সেন্টার ও সুকান্ত সেবা সংঘের অফিসের সামনে পাকা রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে জনৈক বদিউজ্জামানের চা-দোকানের পাশে পুকুরে কিছু সন্দেহজনক বৈদ্যুতিক তার দেখা যাওয়ার সংবাদের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মীর মহিউদ্দিন জিডি এন্ট্রি করে এজাহারকারী এস,আই মো: নুর হোসেনকে নিয়ে ঘটনাস্থলে সকাল ৮:৪৫ ঘটিকায় উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন যে, জনৈক বদিউজ্জামান সরদার গত ২০.০৭.২০০০ ইং তারিখ ভোর ৫:০০ ঘটিকায় তার দোকানে এসে সকালের চা-নাস্তা তৈরীর জন্য একটি সিলভার রংয়ের কলসী নিয়ে পাশে অবস্থিত পুকুর হতে পানি আনতে গেলে পানিতে হলুদ ও নীল রঙের ২টি সরু বৈদ্যুতিক তার দেখে টানাটানি করে উঠাতে না পেরে দোকানে ফিরে আসেন। এর কিছু সময় পর বদিউজ্জামান কোটালীপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, কলেজের পিয়ন জামাল, টি,এন,ও অফিসের পিয়ন ইকবাল এবং পুকুরের মালিক মুজিবুল হককে উক্ত বিষয়টি অবহিত করেন। অনুমান সকাল ৮:০০ টা থেকে ৮:৩০ ঘটিকার সময় ২৫-২৬ বছর বয়সের শ্যামলা রঙের একজন লোককে পুকুর ঘাট থেকে দক্ষিন দিকে যেতে দেখেন। কিছু সময় পর উক্ত বদিউজ্জামান আলু ধোয়ার জন্য আবার পুকুর ঘাটে গিয়ে উক্ত বৈদ্যুতিক তার দেখতে না পেয়ে দাত মাজার ব্রাশ হাতে মুখ ধোয়ার জন্য পুকুর ঘাটে যে লোকটি নেমেছিল ঐ লোকটি দৃশ্যমান তারটি পানিতে লুকিয়ে রেখেছে এরুপ সন্দেহ করেন। বদিউজ্জামানের নিকট ঐসব ঘটনা শুনে এজাহারকারী ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় উক্ত পুকুর ঘাট থেকে অনুমান ৫০-৬০ হাত দক্ষিণে একটি কাঠের সহিত বাধা দু পাশে ঐ তার ধরে সন্তোষ সাধুর দোকানের ভিতর দিয়ে মাটি খুঁড়ে রাস্তার পূর্ব পাশে সন্তোষ সাধুর নির্মীয়মান দোকানের সামনে কাচা মাটির নীচে অনুমান ৮-৯ ফুট খুঁড়ে মোটা পলিথিন এবং কয়লার গুড়া জাতীয় শক্ত জিনিষ দিয়ে তারের সংযোগ দেয়া আছে দেখতে পায়। তিনি উক্ত জিনিষটি একটি শক্তিশালী বোমা মনে করেন। পুলিশ প্রহরা বসিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশ সুপার, গোপালগঞ্জকে অনুরোধ করলে তিনি যশোর সেনানিবাসের এরিয়া কমান্ডারকে সেনাবাহিনীর একটি বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ টিম ঘটনাস্থলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। গত ২০.০৭.২০০০ ইং রাত অনুমান ৮:০০ ঘটিকায় সেনাবাহিনীর একটি

বিশেষজ্ঞদল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান যে, ১৬″ ব্যাস ৪″ ডায়া সম্বলিত ১১″ উচ্চতা বিশিষ্টএকটি লোহার ড্রাম যার পুরত্ব ৮ মিলিমিটার এবং মুখ ঢালাই করা এবং মুখের মধ্য থেকে ৩ টি বৈদ্যুতিক তার বাইরে গিয়েছে -যার মধ্যে ২টি তারের সাহায্যে উক্ত বিশাল বোমা ফাটানোর ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও ২টি ব্যাটারী সংযোগ করে ঐ বোমা ফাটানোর ব্যবস্থা ছিল। সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দল উক্ত বোমাটিকে শক্তিশালী বোমা বলে ধারণা করেন। এজাহারকারী স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে বোমাটির জব্দতালিকা প্রস্তুত করে উহা পরীক্ষা/নিস্ক্রিয় করার জন্য সেবানাহিনীর বিশেষজ্ঞ দলের কাছে হস্তান্তর করেন। গত ১৯.০৭.২০০০ ইং তারিখ দিবাগত রাত যে কোনো সময় উল্লেখিত সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও তার সহযোগীরা উল্লেখিত স্থানে বোমা স্থাপন করেছিল বলে প্রকাশ পেয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত বর্ণনার ব্যক্তি ও অন্যান্য দুষ্কৃতিকারীরা জনজীবন ও সম্পদ নাশ, আইনশৃংখলা রক্ষনাবেক্ষন কাজ বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্থ করার উদ্দেশ্যে উক্ত বোমা হেফাজতে রেখে ও বহন করে স্থাপন পূর্বক ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪ ধারা এবং ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ডি ধারার অপরাধ সংঘটন করার অভিযোগে এস,আই মো: নুর হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাত নামা আসামী উল্লেখে লিখিত অভিযোগ দাখিল করলে কোটালীপাড়া থানার মামলা নং-৫ তারিখ ২০.০৭.২০০০ এর উদ্ভব হয়।

সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজেই মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সিআইডির এ.এস.পি মুন্সী আতিকুর রহমানের নিকট তদন্তভার অর্পন করা হয়। তিনি পুনরায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র অঙ্কন ও সূচীপত্র তৈরী করেন, অন্যান্য আলামত জব্দ করেন, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুযায়ী সাক্ষীদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন এবং উদ্ঘাটিত বোমা ২টি সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞদল দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে মতামত গ্রহণ করেন। তিনি তদন্তকালে কতিপয় আসামীকে গ্রেফতার পূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ করত: কোর্টে প্রেরণ করলে তারা দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে। তদন্তে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমান ও দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী থেকে দেখতে পান যে, উদ্ধারকৃত বোমা ২টি সভাস্থল ও আশে-পাশের ভবন, রাস্তাঘাট, আগত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ অসংখ্য লোকজনের হতাহত, যাহবাহন ও সরকারী সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করার মত অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। উদ্ধারকৃত বোমা সংক্রান্তে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞদলের মতামত নিয়ে তদন্ত শেষে সর্বমোট ১৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪(ক)/৫/৬ তৎসহ ১৯৭৪ সনের

বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫/২৫ডি ধারা প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় অভিযোগ পত্র নং-১৬ তাং-০৮.০৪.২০০১ দাখিল করেন এবং কতিপয় আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হলেও তাদের নাম ঠিকানা না পাওয়ায় তাদেরকে আসামী থেকে বাদ দেন এবং আরও কিছু সংখ্যক আসামীর বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমান না পাওয়ায় তাদেরকে অত্র মামলার দায় থেকে অব্যাহতির প্রার্থনা করেন।

বিচারকালে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১, গোপালগঞ্জ ১৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে দাখিলি অভিযোগপত্র গ্রহণ করেন এবং ২৩ জন আসামীর অব্যাহতির প্রার্থনায় দাখিলি চুড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করত: তাদেরকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করেন। পরবর্তীতে সহকারী পুলিশ সুপার, সিআইডি আসামী মো: আবুল হোসেন ওরফে খোকনের বিরুদ্ধে সম্পুরক অভিযোগপত্র নং-১৫ তারিখ ১৮.০৪.২০০৬ বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১, গোপালগঞ্জ-এ দাখিল করেন। উক্ত ট্রাইব্যুনাল বিগত ০২.০৭.২০০১ ইং, ১৬.০৫.২০০৬ ইং এবং ১৭.০৮.২০০৬ ইং তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিযোগ গঠন করে গঠিত অভিযোগ শুনিয়ে ব্যাখ্যা করলে উপস্থিত আসামীরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করত: বিচার প্রার্থনা করে। পরবর্তীতে আসামী মুফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সী রমনা থানার [ডিএমপি, ঢাকা] মামলা নং ৪৬(৪)০১ তে গ্রেফতার হয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে এবং উহাতে ষড়যন্ত্রকারীসহ সর্বমোট ১৪ জনের নাম প্রকাশ করে। পরবর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তা সহকারী পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম মামলার অধিকতর তদন্তে ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় এবং মুন্সী আব্দুল হান্নান এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী বিবেচনায় নিয়ে সর্বমোট ২৪ জনের বিরুদ্ধে সম্পুরক অভিযোগ পত্র নং-৪৫ তাং-২৯.০৬.২০০৯ দায়ের করেন। উক্ত আসামীদের মধ্যে ৯ জনকে নতুনভাবে যুক্ত করে ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪(ক)(খ)/৫/৬ তৎসহ ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫/২৫ডি ধারায় অভিযোগ আনয়ন করেন।

অত:পর বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য মামলাটির নথি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-২ এ প্রেরণ করলে বিজ্ঞ বিচারক সম্পুরক অভিযোগপত্রে নতুনভাবে সংযুক্ত ৯ জন আসামীসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪(এ)(বি) ধারা ও ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(১)(এ)(বি)(সি) ধারায় বিগত ০১.০৭.২০১০ ইং তারিখে অভিযোগ গঠন করেন। গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামীদের পাঠ করে শুনিয়ে ব্যাখ্যা করা হলে আসামীরা নিজেদের নির্দোষ দাবিতে বিচার প্রার্থনা করে।

জনগুরুত্বপূর্ন বিবেচনায় মামলাটি গোপালগঞ্জ হতে দ্রুত নিস্পত্তির নিমিত্তে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং-স্বমআইন-১/দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-৫/২০১০/৪৮৭১ তারিখ-১৬.০৮.২০১০ ইং মূলে ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নং-৩ এ প্রেরণ করা হয়। অত:পর একই মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং-স্বম(আইন-১/দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ৫/২০১০/৫৪৯৭ তারিখ ২৯.০৯.২০১০ইং মোতাবেক মামলার নথি ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-৩ থেকে ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-২ এ নিস্পত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়। তত্পর এ মামলায় রাষ্ট্র পক্ষ সর্বমোট ৬৩ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেন এবং উপস্থিত আসামীরা তাদের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীগনের মাধ্যমে এবং নিজেরাও উক্ত সাক্ষীদেরকে জেরা করে এবং পলাতক আসামীদের পক্ষে স্টেট ডিফেন্স আইনজীবীও জেরা করেন।

প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষী সমাপ্তির পর উপস্থিত আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করার পর তারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবি করে এবং কয়েকজন আসামী সাফাই সাক্ষী দিবে না মর্মে জানায়। তবে আসামী মো: সাব্বির ওরফে আব্দুল হান্নান নিজেকে নির্দোষ দাবি করত: লিখিত বক্তব্য দাখিল করবে বলে জানায়। আসামী মো: আনিসুল ইসলাম ওরফে আনিস, মো: রাশেদ ড্রাইভার ওরফে মো: আবুল কালাম ওরফে শীমন খান, আরিফ হাসান সুমন ওরফে সুমন ওরফে আব্দুর রাজ্জাক, মেহেদি হাসান ওরফে মেহেদি হোসেন ওরফে আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে গাজী খান নিজেদেরকে নির্দোষ দাবি করে লিখিত বক্তব্য দাখিল করে। আসামী ওয়াসিম আক্তার ওরফে তারেক হোসেন ওরফে তারেক ওরফে মারফত আলী নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বিচার প্রার্থনা করে এবং লিখিত বক্তব্য দাখিল করবে বলে জানায়। কিন্তু আসামী মাওলানা সাব্বির ওরফে আব্দুল হান্নান এবং আসামী ওয়াসিম আক্তার ওরফে তারেক ওরফে মারফত আলী লিখিত বক্তব্য দাখিল করেনি। অপরদিকে আসামী মুফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সীকে সিলেটে সংঘটিত ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর আক্রমনের মামলায় মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে বিগত ১২.০৪.২০১৭ ইং তারিখে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। আসামী-১। খন্দকার কামাল উদ্দিন শাকের ২। মো: সারোয়ার হোসেন মিয়া ৩। মুন্সী ইব্রাহিম ৪। শাহনেওয়াজ ৫। মো: ইউসুফ ওরফে মোসহাব মোড়ল ওরফে আবু মুসা হারুন ৬। মো: লোকমান ৭। শেখ মো: আব্দুল হক ৮। মো: মিজানুর রহমান ৯। হাফেজ জাহাঙ্গীর আলম বদর ১০। মুফ্তি শফিকুর রহমান এবং ১১। মুফতি আব্দুল হাই গং পলাতক থাকায় তাদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা সম্ভব

হয়নি। আসামী মাওলানা সাব্বির ওরফে আব্দুল হান্নান নিজেই তার পক্ষে সাফাই সাক্ষী দিয়েছে এবং তার দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি প্রদর্শনী ক সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ঘটনার সাক্ষ্য, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা এবং আসামীদের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী, বোমা বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টসহ সমস্ত কিছু বিবেচনায় নিয়ে ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক আসামী ১। ওয়াসিম আক্তার তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে মারফত আলী, ২। মো: রাশেদ ড্রাইভার ওরফে আবুল কালাম ওরফে রাশেদুজ্জামান খান ওরফে শীমন খান, ৩। মো: ইউসুফ ওরফে মোসহাব মোড়ল ওরফে আবু মুসা, ৪। শেখ ফরিদ ওরফে মাওলানা শওকত ওসমান, ৫। হাফেজ জাহাঙ্গীর আলম বদর, ৬। মাওলানা আবু বকর ওরফে হাফেজ সেলিম হাওলাদার, ৭। হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া, ৮। মুফ্‌তি শফিকুর রহমান, ৯। মুফ্‌তি আব্দুল হাই এবং ১০। মাওলানা আ: রউফ ওরফে মুফ্‌তি আ: রউফ ওরফে আ: রাজ্জাক ওরফে আবু ওমর গনকে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(১)(এ)(বি)(সি)/২৫ডি ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্তক্রমে তাদের প্রত্যেককে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক গুলি করে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার আদেশ দেন।

তাছাড়া উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক অপর আসামী ১১। মেহেদি হাসান ওরফে আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মেহেদি হোসেন ওরফে গাজী খানকে ঐ একই আইনের ১৫(১)(এ)(বি)(সি)/২৫ডি ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্তক্রমে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করেন এবং আসামী ১২। মো: আনিসুল ইসলাম ওরফে আনিস, ১৩। মো: মহিবুল্লাহ ওরফে মফিজুর রহমান ওরফে মফিজ এবং ১৪। সারোয়ার হোসেন মিয়াদেরকে ঐ একই আইনের ১৫(১)(এ)(বি)(সি) ধারায় তাদের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ পরিবর্তন করে ঐ আইনের ১৫(২) ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্তক্রমে প্রত্যেককে ১৪(চৌদ্দ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন এবং ব্যর্থতায় আরো ০১ (এক) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।

বিজ্ঞ বিচারক আসামী যথাক্রমে ১। খন্দকার মো: কামাল উদ্দিন শাকের, ২। আরিফ হাসান ওরফে সুমন ওরফে আ: রাজ্জাক, ৩। মুন্সী ইব্রাহিম, ৪। মো: শাহনেওয়াজ ওরফে মো: আজিজুল হক, ৫। মো: লোকমান, ৬। শেখ মো: এনামুল হক, ৭। মো: মিজানুর রহমান, ৮। মাওলানা সাব্বির ওরফে আব্দুল হান্নান ওরফে সাব্বির, ৯। মো:

মাহমুদ আজহার ওরফে খান মামুনুর রশিদ ওরফে মাহমুদ এবং ১০। মো: আবুল হোসেন ওরফে খোকন দের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(১) (এ)(বি)(সি)/২৫ডি ধারা এবং ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৪/৬ ধারায় আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত না হওয়ায় তাদেরকে এ মামলার দায় থেকে অব্যাহতি পূর্বক খালাস প্রদান করেন।

এ মামলায় সাক্ষ্য পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে সাক্ষীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানের জন্য এ মামলায় সর্বমোট ৬৩ জন সাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করে পরীক্ষা করেছেন। অপর দিকে আসামী মাওলানা সাব্বির ওরফে আব্দুল হান্নান ওরফে সাব্বির ব্যতীত অন্য কোন আসামী এ মামলায় সাফাই সাক্ষী পরীক্ষা করেনি। ডি.ডব্লিউ-১ হিসেবে উক্ত আসামী নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করলে রাষ্ট্র পক্ষ তাকে জেরা করেন।

এ মামলার পি.ডব্লিউ-১ কোটালীপাড়া থানার সাব ইন্সপেক্টর এবং তিনি মামলার এজাহারকারী। পি.ডব্লিউ-২ মো: বদিউজ্জামান সরদার চা দোকানদার-যার মাধ্যমে বোমা উদ্ধারের সূত্রপাত হয়। পি.ডব্লিউ-৩ জাকির হোসেন তার দোকান ঘরটি সরোয়ার হোসেন মিয়ার মাধ্যমে আসামীদের কাছে ভাড়া প্রদান করে। পি.ডব্লিউ-৪ কৃষ্ণকান্ত বিশ্বাস থানা হাসপাতালের পাশে অবস্থিত মুদি দোকানদার-যিনি পি.ডব্লিউ-৩ এর সাক্ষ্যকে সমর্থন করেন। পি.ডব্লিউ-৫ মো: টুটুল মিয়া রাস্তার পূর্ব পার্শ্বের চায়ের দোকানদার, পি.ডব্লিউ-৬ তপন কুমার রায়, পি.ডব্লিউ-৮ নজরুল ইসলাম, পি.ডব্লিউ-৯ ফজলুল হক ঘটনাস্থলের পার্শ্বের দোকানদার হিসেবে পি.ডব্লিউ-৩ এর বক্তব্যকে সমর্থন করেন। পি.ডব্লিউ-৭ মো: জালাল উদ্দিন শাহ এজাহারকারী পি.ডব্লিউ-১ এবং পি.ডব্লিউ-২ এর বক্তব্য সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেন। পি.ডব্লিউ-১০ শেখ হাবিবুর রহমান ঘটনাটি জেনে পৌরসভার চেয়ারম্যানকে জানান। পি.ডব্লিউ-১১ সুমন হোসেন বাচ্চু এবং পি.ডব্লিউ-১২ মিজানুর রহমান মামলার আসামী আনিসসহ আরো অনেকের সাথে চলাফেরা করতেন। পি.ডব্লিউ-১৩ ফজলুর রহমান দীপু, পি.ডব্লিউ-১৪ মিরাজ হোসেন, পি.ডব্লিউ-১৬ ওবায়েদ মোল্লা এবং পি.ডব্লিউ-১৭ কফিল কৃষ্ণ মন্ডল পূর্বের সাক্ষীদের ধারাবাহিকতায় টেন্ডার ঘোষিত সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-১৫ মো: আলিউজ্জামান হাওলাদার বোমা ২ টি উদ্ধারের ঘটনার শুনা সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-১৮ মো: ফারুক আসামী মুফ্তি হান্নান এবং তার ভাই আনিস একই গ্রামের লোক।

পি.ডব্লিউ-১৯ মোবারক খান প্রসিকিউশন কর্তৃক টেন্ডার ঘোষিত সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-২০ কাজী শহিদুল ইসলাম গোপালগঞ্জ বিসিক মাঠের পাশে ফার্নিচারের দোকানে কাজ করতেন। পি.ডব্লিউ-২১ মো: কামাল হোসেন শেখ পৌরসভার চেয়ারম্যান। পি.ডব্লিউ-২২ মুজিবুল হক-যার পুকুরের মধ্যে বৈদ্যুতিক তার দেখার সূত্রপাত ঘটে। পি.ডব্লিউ-২৩ মো: আকরাম শেখ এবং আসামী মুফতি আব্দুল হান্নান একই গ্রামের অধিবাসী। পি.ডব্লিউ-২৪ মো: আশরাফুল ইসলাম একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি তারেক নামের একজন আসামীকে গ্রেফতার করেন। পি.ডব্লিউ-২৫ এস,এম এমদাদুল হক গোপালগঞ্জ বিসিক এর কর্মকর্তা, তিনি আনিসের নামে এ/৭ নং প্লটটি বরাদ্দের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। পি.ডব্লিউ-২৬ মো: অলিয়র রহমান ওরফে মো: ওয়ালিউর রহমান বোমা উদ্ধারের আগের দিন মুফ্তি হান্নানকে আরেকজন লোকের সাথে চলে যেতে দেখেন এবং ২টি বোমা উদ্ধারের কথা শুনেছেন। পি.ডব্লিউ-২৭ সরোয়ার হোসেন সরদার পূর্ববর্তী সাক্ষীদের ধারাবাহিকতায় টেন্ডার ঘোষিত সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-২৮ মো: মতিউর রহমানের কোটালীপাড়া শেখ লুৎফর রহমান কলেজ রোডের মাথায় এবং আসামী সরোয়ার হোসেন মিয়ার বাড়ীর সামনে অবস্থিত মুদি দোকান রয়েছে। পি.ডব্লিউ-২৯ এ্যাড্ভোকেট দেলোয়ার হোসেন সর্দার এবং পি.ডব্লিউ-৩০ আফজাল চৌধুরী তাদের সাক্ষ্য দ্বারা পি.ডব্লিউ-১০, ২১, ২২ এর সাক্ষ্যকে সমর্থন করেন। পি.ডব্লিউ-৩১ সোবহান মোল্লা প্রসিকিউশন কর্তৃক টেন্ডার ঘোষিত সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-৩২ আয়নাল হোসেন একজন ঠিকাদার। পি.ডব্লিউ-৩৩ হারুনুর রশিদ পূর্বের সাক্ষীর ধারাবাহিকতায় প্রসিকিউশন কর্তৃক টেন্ডার ঘোষিত সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-৩৪ মো: লোকমান শিকদার বোমা পোঁতার ঘটনার শোনা সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-৩৫ শেখ ফরিদ আহমেদ, পি.ডব্লিউ-৩৬ অহিদুল ইসলাম হাজরা [মদন পাড়ের], পি.ডব্লিউ-৩৭ কাজী এনায়েত হোসেন এবং পি.ডব্লিউ-৩৮ মো: বেলাল হোসেন প্রসিকিউশন কর্তৃক টেন্ডার ঘোষিত সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-৩৯ ময়েন উদ্দিন মুন্সী এবং পি.ডব্লিউ-৪০ আতিকুজ্জামান (বাদল) প্রসিকিউশন কর্তৃক বৈরী ঘোষিত সাক্ষী। পি.ডব্লিউ- ৪১ আব্দুল হান্নান হাওলাদার প্রদর্শনী ৬ চিহ্নিত জব্দ তালিকার একজন সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-৪২ মো: মুরাদ হোসেন আসামী মুফ্তি হান্নান মুন্সীর সাবান ফ্যাক্টরীর একজন কর্মচারী। পি.ডব্লিউ-৪৩ মো: হাবিবুর রহমান (প্রবাল) বোমা উদ্ধারের ঘটনার শোনা সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-৪৪ কং/১৮২ প্রবীর ভট্টাচার্য্য উদ্ধারকৃত বোমা দু'টির ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। পি.ডব্লিউ- ৪৫ ওয়ালি আহম্মেদ আব্বাসী এবং পি.ডব্লিউ-৪৬ অসিম কুমার ঘোষ গোপালগঞ্জ বিসিক এর সহকারী ব্যবস্থাপক এবং সম্প্রসারন কর্মকর্তা। তারা

প্রদর্শনী ৫ এর জব্দ তালিকার সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-৪৭ বিকুল হোসেন প্রসিকিউশন কর্তৃক বৈরী ঘোষিত সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-৪৮ মো: ইসরাইল মুফ্তি হান্নানের শ্বশুর বাড়ীর পাশের বাড়ীর লোক হিসেবে পুলিশ কর্তৃক মুফতি হান্নানকে খোঁজতে দেখেছেন। পি.ডব্লিউ-৪৯ মো: হাবিবুর রহমান বোমা উদ্ধারের একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী এবং জব্দ তালিকা প্রদর্শনী ৭ এর সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-৫০ অহিদুল ইসলাম হাজরা পিতা-মৃত বাহাদুর আলম হাজরা [ডহর পাড়ার] জব্দ তালিকার সাক্ষী এবং বোমা উদ্ধারের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। পি.ডব্লিউ-৫১ মো: আমিনুর রহমান গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি কোঠালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার রিকুজিশন পেয়ে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এর উপস্থিতিতে বিসিক এলাকার সোনার বাংলা কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি তল্লাশি করে আলামত উদ্ধার করেন। পি.ডব্লিউ-৫২ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট প্রবীর কুমার চক্রবর্তী সাক্ষী আহাদ হোসেনের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন-যা প্রদর্শনী ৮ হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং তিনি আসামী খন্দকার কামাল উদ্দিন শাকেরের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন-যা প্রদর্শনী ৯ হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং তিনি আসামী সারোয়ার হোসেন মিয়ার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীও লিপিবদ্ধ করেন-যা প্রদর্শনী ১০ হিসেবে চিহ্নিত হয়। পি.ডব্লিউ-৫৩ মো: আতিয়ার রহমান গত ২৩/০৭/২০০০ ইং তারিখে হ্যালিপ্যাডের পূর্ব পাশে উদ্ধারকৃত বোমার জব্দতালিকার সাক্ষী- যা প্রদর্শনী ৭-হিসেবে চিহ্নিত হয়। পি.ডব্লিউ-৫৪ মো: রফিকুল ইসলাম একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আসামী আনিসুল ইসলামের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন-যা প্রদর্শনী ১১ হিসেবে চিহ্নিত হয়। পি.ডব্লিউ-৫৫ মো: শফিক আনোয়ার ঢাকা মহানগর হাকিম হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে রমনা থানার মামলা নং- ৪৬(৪)২০০১-এর আসামী হাফেজ মাওলানা মুফ্তি আব্দুল হান্নানের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে লিপিবদ্ধ করেন-যার ফটোকপি প্রদর্শনী ১২ হিসাবে চিহ্নিত হয়। পি.ডব্লিউ-৫৬ এ,কে, এম, আব্দুস সালাম ঢাকা মহানগর হাকিম হিসেবে কোটালীপাড়ার মামলা নং-৫ তারিখ ২০/০৭/২০০০ ইং এর আসামী আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মেহেদি হাসান ওরফে গাজী খান এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন-যা প্রদর্শনী ১৩ হিসেবে চিহ্নিত হয়। তিনি একই মামলার অপর আসামী মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে ওয়াসিম এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন-যা প্রদর্শনী ১৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়। পি.ডব্লিউ-৫৭ এফ এম মুখলেসুর রহমান গোপালগঞ্জ সার্কেলে সহকারী পুলিশ সুপার

হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার নির্দেশে গত ২৮/০৭/২০০০ ইং তারিখে মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করেন। পি.ডব্লিউ-৫৮ মো: নজরুল ইসলাম (অব:) সিনিয়র এ,এস,পি, সিআইডি জোন, ফরিদপুর গত ১১/০৫/২০০৮ ইং তারিখে পুন:তদন্তের জন্য আদেশ পেয়ে মামলা পুন:তদন্ত করেন। পি.ডব্লিউ-৫৯ মীর মো: মহিউদ্দিন গত ২০/০৭/২০০০ ইং তারিখে কোঠালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন এবং মামলাটির তদন্তভার নিজেই গ্রহণ করেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে গত ২৬/০৭/২০০০ ইং তারিখে মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব সহকারী পুলিশ সুপার মুখলেসুর রহমানের নিকট কেস ডকেটসহ হস্তান্তর করেন। পি.ডব্লিউ-৬০ মো: গিয়াসউদ্দিন, পুলিশ পরিদর্শক হিসেবে গোপালগঞ্জ সদর থানায় কর্মরত ছিলেন। তিনি বিসিক অফিসের উপস্থাপন করা মতে আসামী আনিসুল ইসলামের নামে বরাদ্দকৃত প্লটে এবং মেসার্স সোনার বাংলা কেমিক্যালের কাগজ পত্রাদি পরীক্ষান্তে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন-যা প্রদর্শনী ৫ হিসেবে চিহ্নিত হয়। পি.ডব্লিউ-৬১ মেজর জেনারেল মো: হাবিবুর রহমান খান উদ্ধারকৃত বোমা ২টির পরীক্ষা প্রতিবেদনের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করেন-যা প্রদর্শনী ১৯ হিসেবে চিহ্নিত হয়। পি.ডব্লিউ-৬২ প্রত্যুষ কুমার মজুমদার, সিআইডি ফরিদপুর জোনে কর্মরত ছিলেন। তিনি তদন্তের দায়িত্ব পেয়ে অধিকতর তদন্তের জন্য আদালতে আবেদন করেন এবং অধিকতর তদন্তের দায়িত্ব পেয়ে দায়িত্ব চলাকালে বদলী জনিত কারণে পুলিশ পরিদর্শক মো: আব্দুল হান্নান খান, সিআইডি ফরিদপুর এর নিকট কেস ডকেট হস্তান্তর করেন এবং পি.ডব্লিউ-৬৩ এ.এস.পি মুন্সী আতিকুর রহমান ২০০০ সালে এ,এস,পি, সিআইডি হিসেবে ঢাকাতে কর্মরত ছিলেন। তিনিও মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে ২৭/০৭/২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত তদন্ত করেন। তিনি খসড়া মানচিত্র প্রদর্শনী ২০ এবং সূচীপত্র প্রদর্শনী ২১ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং উহাতে তার স্বাক্ষর প্রদান করেন।

রাষ্ট্র পক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল ড. মো: বশির উল্লাহ অত্র মামলার এজাহারকারী কর্তৃক দায়েরকৃত এজাহার, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন, জব্দকৃত আলামতের জব্দতালিকা, সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক উদ্ধারকৃত বোমার বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন, সাক্ষীগনের সাক্ষ্য এবং বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন পূর্বক নিবেদন করেন যে, মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদি ওয়াসিম আক্তার ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে মারফত আলী নিজেকে সম্পৃক্ত করে এবং অন্যকে জড়িয়ে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেছে। সাজাপ্রাপ্ত অন্য কয়েদি আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মেহেদি হাসান গাজী ওরফে গাজী খান এবং

মুন্সী আনিসুল ইসলাম দ্বয় তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে উক্ত আসামী মারফত আলী ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত মর্মে উল্লেখ করেছে। তাছাড়াও পি.ডব্লিউ-১০ শেখ হাবিবুর রহমান, পি.ডব্লিউ-২০ কাজী শহিদুল ইসলাম, পি.ডব্লিউ-২১ মো: কামাল হোসেন শেখ, পি.ডব্লিউ-২২ মুজিবুল হক, পি.ডব্লিউ-২৪ মো: আশরাফুল ইসলাম, পি.ডব্লিউ-২৯ মো: দেলোয়ার হোসেন সরদার, পি.ডব্লিউ-৩০ আফজাল চৌধুরী, পি.ডব্লিউ-৩২ আয়নাল হোসেন, পি.ডব্লিউ-৪২ মো: মুরাদ হোসেন এবং পি.ডব্লিউ-৬৩ মুন্সী আতিকুর রহমান তাদের সাক্ষ্যে পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করেছেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদি মো: রাশেদ ড্রাইভার ওরফে আবুল কালাম ওরফে রাশেদুজ্জামান খান ওরফে শিমন খান ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার ব্যাপারে সহযোগী আসামী ওয়াসিম আক্তার ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে মারফত আলী, মেহেদী হাসান ওরফে আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মেহেদি হোসেন ওরফে গাজী খান, মুন্সী আনিসুল ইসলাম ওরফে আনিস এবং সারোয়ার হোসেন প্রমুখ তাদের প্রদত্ত ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দীতে এ আসামীর সরাসরি সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেছে। এছাড়াও পি.ডব্লিউ-১ মো: নুর হোসেন (উপ-পরিদর্শক), পি.ডব্লিউ-২ বদিউজ্জামান সরদার, পি.ডব্লিউ-৩ জাকির হোসেন, পি.ডব্লিউ-২১ মো: কামাল হোসেন শেখ, পি.ডব্লিউ-৩২ আয়নাল হোসেন, পি.ডব্লিউ-৫০ ওয়াহিদুল ইসলাম হাজরা, পি.ডব্লিউ-৫৩ আতিয়ার রহমান, পি.ডব্লিউ-৪৯ মো: হাবিবুর রহমান গং তাদের সাক্ষ্যে উক্ত আসামী ঘটনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল মর্মে বক্তব্য প্রদান করে উক্ত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদি মো: ইউসুফ ওরফে মুসহাব মোড়ল ওরফে আবু মুসা হারুন (পলাতক) কে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত মর্মে সহযোগী আসামী মুফ্তি হান্নান, মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে ওয়াসিম আক্তার, আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে গাজী খান, মুন্সী আনিসুল ইসলাম ওরফে আনিস এবং সারোয়ার হোসেন তাদের প্রদত্ত ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দীতে উল্লেখ করে। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী পি.ডব্লিউ-২২ মুজিবুল হক এবং পি.ডিব্লউ-৪২ মুরাদ হোসেন পরস্পরকে সমর্থন করে এ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমান করেন।

সহযোগী আসামী মুফ্তি হান্নান, মেহেদি হাসান ওরফে আব্দুল ওয়াদুদ এবং ওয়াসিম আক্তার ওরফে তারেক গং তাদের প্রদত্ত ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার

জবানবন্দীতে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী শেখ ফরিদ ওরফে মাঃ শওকত ওসমানের ঘটনার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার কথা পরিষ্কারভাবে বর্ননা করেছেন। তাদের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শেখ ফরিদ অন্যদেরকে আফগানিস্তানে পাঠাতো ট্রেনিং নেয়ার জন্য। তিনি তালেবান সংগঠন বাংলাদেশ শাখার মহাসচিব হিসেবে পরিচিত।

আসামী মুফ্তি হান্নান তার প্রদত্ত ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দীতে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী জাহাঙ্গীর আলম বদর, মৃত্যুদুন্ডপ্রাপ্ত আসামী মাওলানা আবু বকর ওরফে হাফেজ সেলিম হাওলাদার ঘটনা সংঘটনের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত মর্মে উল্লেখ করে। তাছাড়াও আসামী খন্দকার কামাল উদ্দিন সাকের তার প্রদত্ত ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দীতে উক্ত আসামী মাওলানা আবু বকর নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংঘটনগুলোর সঙ্গে জড়িত মর্মে বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

আসামী মুফ্তি আব্দুল হান্নান, মুন্সী আনিসুল ইসলাম এবং খন্দকার কামাল উদ্দিন সাকের গং ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দীতে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদী হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া সংঘটিত ঘটনার ষড়যন্ত্রসহ বোমা পোঁতার সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত মর্মে উল্লেখ করে।

মুফ্তি আব্দুল হান্নান তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী মুফ্তি শফিকুর রহমানের জড়িত থাকার কথা উল্লেখ করে- যেখানে বলা হয়েছে যে, এই আসামী সহ অন্যান্য আসামীগন গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ঘটনা সংঘটনের জন্য সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঘটনা সংঘটনের জন্য এ আসামীই মূলত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন কারণ তিনি হরকাতুল জেহাদের আমীর। শুধু তাই নয়, এই আসামী বিদেশ থেকে তহবীল সংগ্রহ করে টাকা পয়সার যোগান দিত এবং বাংলাদেশের ভিতর ও বাহির থেকে অস্ত্র গোলা-বারুদ ক্রয় করতো।

আসামী মুফ্তি হান্নান, আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মেহেদি হাসান এবং কামাল উদ্দিন সাকের গং তাদের প্রদত্ত ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দীতে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী মুফ্তি আব্দুল হাই ঘটনা সংঘটনের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত মর্মে উল্লেখ করে। গাজী খান তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছে যে, মুফ্তি আব্দুল হাই জাগো মুজাহিদ পত্রিকার সম্পাদক এবং হরকাতুল জিহাদ সংগঠনের লোক। কামাল উদ্দিন শাকের বলেছে যে, মুফ্তি আব্দুল হাই হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর আমীর ছিল।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদী মাওলানা আব্দুর রউফ ওরফে আব্দুর রাজ্জাক ওরফে আবু ওমর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ছিল মর্মে আসামী মুফ্তি হান্নান এবং মুন্সী আনিসুল ইসলামদ্বয়ের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে প্রকাশ পায়। এ আসামী সংঘটিত ঘটনার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেন। এ আসামী ইতোমধ্যে আফগানিস্থানে যুদ্ধও করেছিল বলে প্রকাশ করে।

যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত মেহেদি হাসান ওরফে আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মেহেদি হোসেন ওরফে গাজী খান ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে ঘটনার সাথে সে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল মর্মে উল্লেখ করে। অপর আসামী ওয়াসিম আক্তার ওরফে তারেক ওরফে মারফত আলী তার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দীতে বলে যে, গাজী খান ওরফে আব্দুল ওয়াদুদ, মুফ্তি হান্নানের সাবান কারখানার সন্ধান দেয় এবং মোজাহিদ ও তালেবানদের সাথে দেখা হবে বলে জানায়। তাছাড়াও রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী নং-৪২ মুরাদ হোসেন তাকে ডকে শনাক্ত করেন এবং তিনি ইতোমধ্যে এ আসামীকে দেখেছিলেন।

১৪ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামী মো: আনিসুল ইসলাম ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করে। সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে তার জবানবন্দীকে সমর্থন করে আসামী ওয়াদুদ ওরফে মেহেদি হাসান এবং মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে ওয়াসিম আক্তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে। এ ছাড়াও রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৩ মো: জাকির হোসেন, পি.ডব্লিউ-২১ মো: কামাল হোসেন শেখ, পি.ডব্লিউ-৪২ মো: মুরাদ হোসেন এবং পি.ডব্লিউ-৪৩ মো: হাবিবুর রহমান তাদের প্রদত্ত সাক্ষ্যে এ আসামী ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত মর্মে পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

আসামী আহাদ হোসেন (পরবর্তীতে অত্র মামলায় সাক্ষী), আসামী আবদুল ওয়াদুদ এবং আসামী আনিসুল ইসলাম তাদের প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে আসামী মুহিবুল্লাহ ওরফে মফিজ সংঘটিত ঘটনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত মর্মে উল্লেখ করে বক্তব্য দেয়। তাছাড়াও পি.ডব্লিউ-৪২ মুরাদ হোসেনও তার সাক্ষ্যে আসামী মুহিবুল্লাহ ওরফে মফিজের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার কথা বর্ণনা করেন এবং তাকে ডকে শনাক্ত করেন।

১৪ বৎসরের সশ্রম দন্ডপ্রাপ্ত আসামী সারোয়ার হোসেন মিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করে। আসামী আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মেহেদি হাসান তার জবানবন্দীতে এ আসামীকে সাবান কারখানায় দেখেছে মর্মে উল্লেখ করেছে।

বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল জনাব ড. মো: বশির উল্লাহ এর উক্তরুপ বক্তব্য সমর্থন করে বিজ্ঞ অ্যাটর্নী জেনারেল জনাব এ.এম. আমিন উদ্দিন আরো যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, বিগত ১৯/১১/২০০৬ ইং তারিখে আসামী মুফ্তি হান্নান রমনা থানার মামলা নং-৪৬ তারিখ ২৪/৪/২০০১ ইং-তে স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে নিজেকে এবং অন্যান্য আসামীদেরকে সম্পৃক্ত করে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছে। তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পরীক্ষা করলে দেখা যায়, উহা কোন ভয়-ভীতি বা চাপ-প্রয়োগের মাধ্যমে আদায় করা হয়নি। সম্পূর্ন স্বেচ্ছায় উক্ত আসামী দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেছে। উক্ত জবানবন্দীর ফটোকপি রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী পি.ডব্লিউ-৫৫ মো: শফিক আনোয়ার, ঢাকা মহানগর হাকিম, প্রদর্শনী-১২ হিসেবে বিচারিক আদালতে প্রমান করেন। উক্ত সাক্ষীকে আসামী পক্ষ বিস্তারিতভাবে জেরা করেন কিন্তু আসামীর জবানবন্দীতে দেয়া বক্তব্য সম্পর্কে কোন বিরুপ প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। আইন অনুযায়ী আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আসামীপক্ষ কোন plea নিলে তা তাদেরকেই প্রমান করতে হয়। অর্থাৎ আসামীপক্ষকে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীর বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমান করতে হবে। তিনি আরে বলেন যে, এই আসামীর স্বীকারোক্তীমূলক জবানবন্দীর ফটোকপি অন্য মামলায় প্রদর্শিত হয়েছে যার ফটোকপি গ্রহণযোগ্য মর্মে মাননীয় আপীল বিভাগ মুফ্তি আব্দুল হান্নান বনাম রাষ্ট্র **[৬৯ ডিএলআর (আপীল বিভাগ) পৃষ্ঠা-৪৯০]** মামলায় সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। সুতরাং বিচারিক আদালত উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীকে আমলে নিয়ে অত্র মামলায় গ্রহণযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত দিয়ে কোন ভুল করেননি। এছাড়াও বিচারিক আদালতে উক্ত জবানবন্দীর সহি মোহর নকল বিগত ২৬.০৬.২০০৮ ইং তারিখে বিজ্ঞ পিপি কর্তৃক দাখিল করা হয়, যা নিম্ন আদালতের ১৫৪ নং আদেশে উল্লেখ আছে।

বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল আরো নিবেদন করেন যে, যেহেতু সর্বোচ্চ আদালত আসামী মুফ্তি হান্নানের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী আইনসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বলে অন্য মামলায় **[ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর হামলার মামলায়]** সিদ্ধান্ত

প্রদান পূর্বক বিবেচনা ও গ্রহণ করেছেন সেহেতু অত্র মামলায় মুফ্‌তি হান্নানকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পুনরায় পরীক্ষা করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নী জেনারেল আরো বলেন যে, কোন অপরাধ কর্মের ষড়যন্ত্র প্রকাশ্য দিবালোকে হয় না। ষড়যন্ত্র অতি সংগোপনে অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সময় টেলিফোনের মাধ্যমে এ ধরনের ষড়যন্ত্র হতে পারে। সেক্ষেত্রে অন্য কোন সাক্ষী থাকার সুযোগ থাকে না। বর্তমান মামলায়ও মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই তাদের মোহাম্মদপুরস্থ বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এবং মুগদা পাড়া অফিসে বসে ধবংসাত্মক কার্য্যের মধ্য দিয়ে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উক্ত ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য উদ্ধারকৃত বোমা দুটি ঘটনাস্থলে আসামী মুফ্‌তি হান্নানের নেতৃত্বে পোঁতা হয়েছিল। উক্ত বোমা বিস্ফোরিত হলে ২০০৪ সনের ২১ আগষ্টে সংঘঠিত গ্রেনেড হামলার ন্যায় আরেকটি বিভীষিকাময় অধ্যায়ের সৃষ্টি হতো। কারণ উদ্ধারকৃত বোমা দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও ধবংসাত্মক ছিল। বোমা দুটি সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞদল পরীক্ষা করে তার প্রতিবেদন দাখিল করেন- যা প্রদর্শনী-১৯ হিসেবে চিহ্নিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে যে, উদ্ধারকৃত বোমা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ভয়ংকর বিধ্বংসী ছিল। দুটি বোমার মধ্যে একটিও যদি বিস্ফোরিত হতো তাহলে এক কিলোমিটার এলাকা ব্যাপী ধবংসলীলায় রুপান্তরিত হতো । এমনকি ভূ-গর্ভের ৯ ফুট ৫ ইঞ্চি গভীরে এবং ৩৪ ফুট উপরের দিকে প্রভাব বিস্তার করতো। মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত এ আসামীগন এমন একটি ভয়ংকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল-যা পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হলে এদেশে আরেকটি ভয়ংকর বিভিষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হতো। সুতরাং বিচারিক আদালত তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে যে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করেছে তা যথার্থ এবং আইন সম্মত।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নী জেনারেল সর্বশেষ নিবেদন করেন যে, এ আসামীরা কোনভাবেই অনুকম্পা পেতে পারেন না কারণ তারা এমন একটি অপরাধ সংঘটন করেছিল যা দেশ ও জাতির জন্য মারাত্মক ধরনের হুমকি স্বরুপ । কাজেই তিনি ডেথরেফারেন্সটি অনুমোদন (confirmation) পূর্বক বিচারিক আদালত কর্তৃক মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদিদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত শাস্তিসহ অন্যান্য দন্ডপ্রাপ্ত আসামীদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত শাস্তি বহাল রেখে তাদের দায়েরকৃত সকল আপীল ও জেল আপীল খারিজ করার আবেদন করেন।

বিজ্ঞ অ্যাটর্নী জেনারেল তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে ৬১ ডিএলআর (আপীল বিভাগ) পৃষ্ঠা-৪৯০, ৬৭ ডিএলআর (এডি) পৃষ্ঠা-৬, ১৯ বিএলসি (এডি) পৃষ্ঠা-৮, এডিসি স্পেশাল ইস্যু-

২০১০ ভলিয়ম-৬এ (বঙ্গবন্ধু মার্ডার কেইস), (২০১৩) ১৩ এসসিসি-পৃষ্ঠা-১, (১৯৯৯) ৫ এসসিসি পৃষ্ঠা-২৫৩ (রাজীবগান্ধী মার্ডার কেইস) এবং (২০০১) ৭ এসসিসি, পৃষ্ঠা-৫৯৬ তে প্রকাশিত মোকাদ্দমার নজির সমূহ তুলে ধরেন।

অপরপক্ষে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদি ও আপীলকারী যথাক্রমে ওয়াসিম আক্তার ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে মারফত আলী, মাওলানা আবু বকর ওরফে হাফেজ সেলিম হাওলাদার, মো: রাশেদ ড্রাইভার ওরফে আবুল কালাম ওরফে রাশেদুজ্জামান খান ওরফে শিমন খান এবং হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়াদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ আহসান যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, কথিত বোমা উদ্ধারের বিষয়ে সাক্ষীদের সাক্ষ্যে যথেষ্ট অসংগতি রয়েছে। বিশেষ করে আলামত জব্দের সময় এবং স্থান নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, আপীলকারী ওয়াসিম আক্তার ওরফে তারেক-এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে ঢাকার বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া এ আসামীর জবানবন্দী ১ ঘন্টার মধ্যে রেকর্ড করায় উহার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ পরিলক্ষিত হয়। ঘটনার স্থান গোপালগঞ্জ অথচ আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী বিধি বহির্ভূতভাবে গোপালগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ঢাকায় রেকর্ড করা কতটুকু যুক্তিসংগত ও আইনসিদ্ধ তা বিবেচনায় নেওয়া উচিত। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো বলেন যে, আসামী মুফ্তি হান্নান রমনা থানার মামলা নং-৪৬(৪)২০০১ তে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেছে-যাতে অনেকগুলি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। একজন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে অনেকগুলি ঘটনার বর্ণনা দেয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ে পুরোপুরি অসম্ভব। অথচ এ আসামী ২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে জনসভায় হামলার ঘটনা সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেনি। তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনা করলে মনে হয় জবানবন্দী রেকর্ডের সময় সে স্বাভাবিক ছিল না এবং শারিরীক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে তাকে উক্ত জবানবন্দী প্রদানে বাধ্য করা হয়েছিল। এছাড়াও এক মামলার জবানবন্দী অন্য মামলায় ব্যবহার করা কোনক্রমেই আইন সম্মত নয়। শুধু তাই নয়, তদন্তকারী কর্মকর্তা মুফ্তি হান্নানের জবানবন্দী রেকর্ডের ক্ষেত্রে পি আর বি-এর ২৮৩ ধারার বিধান অনুসরণ করেনি। তার প্রস্তুতকৃত Case Diary-তে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার জবানবন্দীর কোন নমুনা পাওয়া যায় না। তার প্রদত্ত জবানবন্দীর বিষয়ে আসামী মুফ্তি হান্নানকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় বর্তমান

মামলায় পরীক্ষা করা হয়নি। কারণ ইতিমধ্যেই সিলেটে ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর আক্রমনের মামলায় তার মুত্যুদন্ড কার্যকর হয়েছিল। ফলে বর্তমান মামলায় তার প্রদত্ত উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী ব্যবহার করা আইনসিদ্ধ নয়। এছাড়াও, মুফ্তি হান্নান জবানবন্দী দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

বিজ্ঞ আইনজীবী আরো বলেন যে, আসামী মো: রাশেদ ড্রাইভার, মাওলানা আবু বকর এবং হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া-এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য অথবা অবস্থাজনিত সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে পারেননি। শুধুমাত্র সহযোগী আসামী মুফ্তি আব্দুল হান্নান এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে তাদের নাম প্রকাশ পায়। এটা আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতি যে, নিরপেক্ষ সমর্থনমূলক সাক্ষ্য ব্যতীত শুধুমাত্র সহযোগী আসামীর দোষ স্বীকারোক্তির বর্ণনার উপর ভিত্তি করে কোন আসামীকে অপরাধী চিহ্নিত করে তাকে সাজা প্রদান করা যাবে না। এ মামলায় কথিত বোমা উদ্ধারের ঘটনার তথ্য প্রদানকারী পি.ডব্লিউ-২ একজন সুবিধাভোগী। রাষ্ট্র তার চাকুরীর ব্যবস্থাও করেছে। তাকে দিয়ে কথিত ঘটনার অবতারণা করে আসামীদেরকে মিথ্যাভাবে জড়ানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর জনসভা উপলক্ষে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং মানুষের সমাগমের মধ্যে কথিত বোমা হেলিপ্যাডের পাশে এবং পি.ডব্লিউ-২ এর দোকান থেকে ৫০-৬০ গজ দূরে মাটিতে পোঁতে রাখা বিশ্বাস যোগ্য নয়। এমনকি প্রথম বোমা উদ্ধারের পরও প্রধানমন্ত্রী গত ২২/০৭/২০০০ ইং তারিখের অনুষ্ঠান বাতিল করেননি। অনুষ্ঠানের পরের দিন হেলিপ্যাডের পাশ থেকে আরেকটি বোমা উদ্ধার হওয়া অসম্ভব একটি ব্যাপার। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, আপীলকারী মো: আবু বকর ওরফে সেলিম হাওলাদার এর পরিচয় নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষ যে সময়ে ঘটনার কথা উল্লেখ করেছে সে সময় উক্ত ব্যক্তি নাবালক ছিল। তার পক্ষে জঙ্গি সংগঠনের নেতা হওয়া কিংবা এ ধরনের ঘটনার পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব।

বিজ্ঞ আইনজীবী আরো উল্লেখ করেন যে, আসামীদের সামনে বিচারিক আদালত কর্তৃক incriminating evidence উপস্থাপন করা হয়নি। নথিতে থাকা মামলার উপাদানগুলো বিবেচনায় না নিয়ে আসামীদের বিরুদ্ধে যান্ত্রিকভাবে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া অভিযোগ গঠন করা হয় ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(১)(এ)(বি)(সি) ধারায় অথচ তাদেরকে দোষী সাব্যস্থ করে দন্ড প্রদান করা হয়েছে ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(১)(এ)(বি)(সি)/২৫ডি ধারায়। রায় দেয়ার সময় ধারা পরিবর্তন করার কোন আইনগত বিধান নেই । শুধুমাত্র

ফৌজদারী কার্যবিধির ২২৭ ধারা অনুযায়ী চার্জ পরিবর্তন করা সম্ভব । বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যের সমর্থনে ১২ ডিএলআর [এসসি] ১৫৬ এবং ২১৭, ৩৭ ডিএলআর [এডি] (১৯৮৫)-১৩৯, ২ ডিএলআর[পিসি] ৩৯, ৬৯ ডিএলআর [এডি] ৪৯০, ৫১ ডিএলআর [হাইকোর্ট] ৫৭, (১৯৭৩)২ এসসিসি-৯৭৩ এবং (২০১০) ১০ এসসিসি-৪৩১ তে প্রকাশিত নজির সমূহ উপস্থাপন করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী মো: ইউসুফ ওরফে মোসহাব মোড়ল ওরফে আবু মুসা হারুন, হাফেজ জাহাঙ্গীর আলম বদর, মুফ্তি শফিকুর রহমান এবং মুফতি আব্দুল হাই এর পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব অমূল্য কুমার সরকার যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, আসামী মো: ইউসুফ ওরফে মোসহাব মোড়ল ওরফে আবু মুসা হারুন ব্যতীত অপর ০৩ (তিন) জন আসামীর নাম মুফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে ঘটনার সম্পৃক্ততায় আর কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অথবা সমর্থনমূলক সাক্ষ্য প্রসিকিউশন পক্ষ উপস্থাপন করতে পারেননি। বিজ্ঞ আইনজীবী ৩বিএলসি (এডি) পৃষ্ঠা-৫৩ তে প্রকাশিত নজির উল্লেখ পূর্বক উচ্চ আদালতের মতামত সম্পর্কে বলেন যে, ***''Confession of an accused is not a substantive piece of evidence against the co-accused and such evidence alone without corroborative evicance can not form the basis of conviction of a co-accused.''*** এ ০৩ (তিন) জন আসামীকে ঘটনার অনেক পরে দ্বিতীয় সম্পূরক অভিযোগপত্রে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে শুধুমাত্র আসামী মুফতি হান্নানের জবানবন্দীর উপর ভিত্তি করে। এ আসামীদেরকে বিচারিক আদালত অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় সর্বোচ্চ দন্ড প্রদান করেছেন। সুতরাং তারা খালাস পাবার হকদার বটে। তিনি বলেন অপর মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী মো: ইউসুফ ওরফে মোসহাব মোড়ল ওরফে আবু মুসা হারুন প্রথম অভিযোগপত্র ভূক্ত আসামী। আসামী মুফ্তি হান্নান, মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে ওয়াসিম আক্তার, আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে গাজী খান, মুন্সী আনিসুল ইসলাম এবং সারোয়ার হোসেন মিয়া তাদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে ঘটনার সাথে এ আসামীর সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করেছে। তাছাড়াও পি.ডব্লিউ-২১, ২২, এবং ৪২ সংঘটিত ঘটনায় সম্পৃক্ততার বিষয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেছে সত্য কিন্তু তা দ্বারা তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়

মর্মে দাবী করেন এবং এই আসামীর সর্বোচ্চ দন্ড মওকফ করা হলে সুবিচার সুনিশ্চিত হবে বলে তিনি নিবেদন করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদী মাওলানা আব্দুর রউফ ওরফে মুফ্‌তি আব্দুর রউফ ওরফে আব্দুর রাজ্জাক ওরফে আবু ওসমান এবং দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আনিসুল ইসলাম ওরফে আনিস এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী মো: নাসির উদ্দিন বলেন যে, আসামী মাওলানা আব্দুর রউফকে এ মামলায় দাখিলকৃত প্রথম অভিযোগ পত্রে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। সম্পুরক অভিযোগপত্রে তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র সহযোগী আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর উপর ভিত্তি করে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কিংবা অবস্থাজনিত সাক্ষ্য দ্বারা রাষ্ট্রপক্ষ তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমান করতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ মামলার ঘটনার মধ্য দিয়ে কোন হতাহত সংঘটিত হয়নি। কাজেই বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ডি ধারা অনুযায়ী এই আসামীকে দন্ড দেয়া যুক্তিযুক্ত হয়নি। এ আসামী দীর্ঘদিন যাবৎ কনডেম সেলে বন্দী অবস্থায় আছে। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, সাজাপ্রাপ্ত মো: আনিসুল ইসলাম ওরফে আনিস তার প্রদত্ত জবানবন্দীতে ঘটনার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেনি। অন্যান্য আসামীরা প্রায়শঃই তার মালিকানাধীন প্লটে নির্মিত সাবান কারখানাতে বৈঠক করেছে এবং সে তা অবলোকন করেছে মর্মে জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে অন্য কোন সাক্ষ্য রাষ্ট্রপক্ষ উপস্থাপন করতে পারেনি। শুধুমাত্র সাবান কারখানার প্লটের মালিক এবং আসামী মুফ্‌তি হান্নানের সহোদর ভাই হওয়ার কারণে তাকে সাজা প্রদান করা হয়েছে। ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(২) ধারা এই আসামীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এই আসামীকে ১৪ বছরের স্বশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এই আসামী প্রায় ৭(সাত) বৎসর ৬(ছয়) মাসের অধিক দন্ড ভোগ করেছে। সুতরাং উভয় আসামীদ্বয়ের দায়েরকৃত আপীল মঞ্জুর পূর্বক তাদেরকে এ মামলার দায় হতে মুক্তি দেয়ার জন্য তিনি নিবেদন করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী শেখ ফরিদ ওরফে মাওলানা শওকত ওসমান এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব এস. এম. শাহজাহান যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে বলেন যে, এ আসামী ঘটনার সাথে জড়িত মর্মে এজাহারে কোনভাবে সন্দেহ করা হয়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তা দ্বিতীয় সম্পুরক অভিযোগপত্রের মাধ্যমে তাকে অভিযুক্ত করেছে একজন সহায়তাকারী (abettor) হিসেবে। রাষ্ট্রপক্ষের পরীক্ষিত ৬৩ জন সাক্ষীর মধ্যে কেউই তার বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাক্ষ্য প্রদান করেননি। শুধুমাত্র রমনা থানার মামলা

নং-৪৬(৪)২০০১-তে আসামী মুফ্তি হান্নান বর্তমান মামলার ঘটনার বহুদিন পরে প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এই আসামীর নাম প্রকাশ করেছে। সমর্থক সাক্ষ্য ব্যতীত শুধুমাত্র সহযোগী আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর উপর ভিত্তি করে দোষী সাব্যস্ত এবং দন্ড দেয়া আইনসিদ্ধ নয়। রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক আনীত বর্তমান মামলার ঘটনার অভিযোগের তারিখ দেখানো হয়েছে ২০/০৭/২০০০ ইং অথচ মুফ্তি হান্নান রমনা থানার মামলা নং-৪৬(৪)২০০১-তে জবানবন্দী প্রদান করেছিল গত ১৯/১১/২০০৬ ইং তারিখে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরও উল্লেখ করেন যে, আপীলকারী গত ২৬/০৭/২০০০ ইং তারিখ থেকে বহু বছর যাবৎ কারাগারে আবদ্ধ আছে। জনাব এস,এম শাহজাহার তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে ৫৬ ডিএলআর-১৮৫, ২ ডিএলআর- ২৯৭ এবং ২৭ ডিএলআর [এডি]-২৯ তে প্রকাশিত নজির সমূহ তুলে ধরেন।

আমরা উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবনসহ তাদের উপস্থাপিত নজির সমূহ, সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান, নিম্ন আদালতের রায় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মামলার যাবতীয় নথি পর্যালোচনা করলাম। প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ন সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় পি.ডব্লিউ-০১. এজাহারকারী এস, আই মো: নুর হোসেন এজাহার সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি কোটালীপাড়া থানায় কর্মরত থাকাকালীন গত ২০.০৭.২০০০ ইং তারিখ কর্তব্যরত কং/২০০ স্বপন ঘোষ এবং কং/২৯২ অলিউর এবং পৌরসভার চেয়ারম্যান কামাল হোসেন টেলিফোনের মাধ্যমে তাকে জানান যে, কোটালীপাড়া থানা থেকে অনুমান ২ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে কমিউনিটি সেন্টার ও সুকান্ত সেবা সংঘের অফিসের সামনে পাকা রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে জনৈক বদিউজ্জামানের চায়ের দোকানের পাশে পুকুরে কিছু সন্দেহ জনক বৈদ্যুতিক তার দেখা গেছে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত সংবাদটি সাধারন ডাইরীভূক্ত করে তাকেসহ সকাল ৮:৪৫ ঘটিকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবহিত হন যে, জনৈক বদিউজ্জামান সরদার ভোর বেলায় তার দোকানে এসে সকালের নাস্তা তৈরীর জন্য একটি কলসী নিয়ে পুকুর থেকে পানি আনতে গেলে পুকুরে হলুদ ও নীল রং এর সরু ০২ টি বৈদ্যুতিক তার দেখতে পান। তখন সময় অনুমান ভোর ৫:৪১ ঘটিকা। সে উক্ত ঘটনাটি সকাল ৬:০০ ঘটিকায় কলেজের পিয়ন জামাল, কিছু সময় পর কোটালীপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান কামাল হোসেন, টিএনও অফিসের পিয়ন ইকবাল এবং জনৈক মুজিবুল হককে জানায়। তিনি কিছুক্ষণ পর আলু ধোয়ার জন্য আবার পুকুর ঘাটে গিয়ে উক্ত বৈদ্যুতিক তার না দেখতে পেয়ে মুখ ধোয়ার জন্য যে লোকটি পুকুর ঘাটে গিয়েছিল ঐ লোকটি বৈদ্যুতিক তার গুলো লুকিয়ে রেখেছে মর্মে তার সন্দেহ হয়।

বদিউজ্জামানের নিকট থেকে ঐসব ঘটনা শুনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় উক্ত পুকুর ঘাট থেকে অনুমান ৫০-৬০ হাত দক্ষিণে একটি কাঠির সহিত বাঁধা দু' পার্শ্বে ঐ তার ধরে সন্তোষ সাধুর দোকানের সামনে মাটি খুঁড়ে রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে কাঁচা মাটির নীচে অনুমান ৮"-৯" ইঞ্চি মোটা পলিথিন এবং কয়লার গুড়া শক্ত জিনিষ তারের সাথে সংযোগরত অবস্থায় আছে মর্মে দেখতে পান। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত স্থানে একটি শক্তিশালী বোমা সাদৃশ্য বস্তু আছে মর্মে সন্দেহ করে সেখানে পুলিশ প্রহরা বসানোর জন্য গোপালগঞ্জের পুলিশ সুপারকে অনুরোধ করেন। পুলিশ সুপার যশোর সেনানিবাসের এরিয়া কমান্ডারকে সেনাবাহিনীর একটি বিস্ফোরক দ্রব্য বিশেষজ্ঞ দলকে ঘটনাস্থলে পাঠানোর অনুরোধ করলে রাত্রি অনুমান ৮:০০ ঘটিকার সময় ঐ বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে আসে। তারা দেখতে পান যে, ১৬" ব্যাস, ৪" ডায়া ও ১১" উচ্চতার একটি লোহার ড্রাম যার পুরত্ব ৮ মি.মি, ওজন অনুমান ৪০ কেজি যার মুখ ঢালাই করা ড্রামের মধ্য থেকে ০৩ টি তার বাইরে গিয়েছে এবং এর মধ্যে ০২ টি তারের সাহায্যে উক্ত বিশাল বোমা ফাটানোর ব্যবস্থা ছিল। এছাড়াও ২ টি ব্যাটারীর সংযোগ করে ঐ বোমা ফাটানোর প্রস্তুতি ছিল। - সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দল উদ্ধারকৃত উক্ত বোমাটিকে শক্তিশালী বোমা বলে ধারনা করেন। উক্ত শক্তিশালী বোমাটি সাক্ষীদের মোকাবেলায় তিনি জব্দ করেন এবং উহা নিস্ক্রিয় করার জন্য সেনাবাহিনীর নিকট বুঝিয়ে দেন। এ সাক্ষী আরো বলেন যে, গত ২৩.০৭.২০০০ ইং তারিখ বোমা বিশেষজ্ঞ দলের সদস্য ক্যাপ্টেন কাওছার কোটালীপাড়ার হ্যালিপ্যাডের সন্নিকট থেকে উদ্ধারকৃত বোমা নিস্ক্রিয় করাকালীন ৫ ধরনের আলামত নমুনা স্বরুপ সাক্ষীদের মোকাবেলায় জব্দ করেন। জব্দকৃত উক্ত ৫ প্রকার বোমার ভিতরে থাকা উপকরনের নমুনা হতে (ক) ডেটনেটিং চার্জের নমুনা, (খ) হাই এক্সপ্লোসিভ ফিলিং, (গ) ফ্রিকোলন কম্পাউন্ড, (ঘ) ব্রুষ্টার চার্জ ও কয়েকটা (ঙ) স্প্লীন্টার প্রজেক্টর (জালের কাঠি) জব্দ করত: জব্দনামা প্রস্তুত করে সাক্ষীদের স্বাক্ষর নেন ও জব্দকৃত আলামতগুলো নিজ হেফাজতে নেন। এই সাক্ষী জেরায় উল্লেখ করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোটালীপাড়ায় আগমনের তারিখ ছিল গত ২২.০৭.২০০০ ইং এবং ২য় বোমাটি কোটালীপাড়ায় হ্যালিপ্যাডের সিঁড়ির সামনে থেকে উদ্ধার করা হয়। এ সাক্ষী জেরায় আরো বলেন যে, ঘটনাস্থলের আশে পাশে আবাসিক বাসা-বাড়ী, অফিস-আদালত এবং দোকান-পাট এবং চলাচলের রাস্তা আছে। উক্ত সাক্ষীকে জেরার মাধ্যমে আসামীপক্ষ তার প্রদত্ত জবানবন্দীর তেমন কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি।

এজাহারকারী পি.ডব্লিউ- ১ এর বক্তব্য সমর্থন করে পি.ডব্লিউ-২ চা দোকানদার বদিউজ্জামান সরদার তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি পুকুরে কলসীতে পানি ভরার জন্য গেলে সর্বপ্রথম সন্দেহজনক বৈদ্যুতিক তারের সন্ধান পান। উক্ত তার দেখার বিষয়ে চা খেতে আসা কোটালীপাড়া কলেজের পিয়ন জালাল, এরপর পৌরসভার চেযারম্যান কামাল হোসেন, টিএনও অফিসের পিয়ন ইকবাল এবং ঐ পুকুরের মালিক মুজিবুল হককে উক্ত ঘটনার কথা বলেন এবং দেখান। পৌরসভার চেয়ারম্যান টেলিফোনে বিষয়টি থানা কর্তৃপক্ষকে জানায়। অনুমান সকাল ৮:০০/৯:০০ ঘটিকার সময় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ ০১ নং সাক্ষী-এজাহারকারী ঘটনাস্থলে পৌছান। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেন এবং রাত্র অনুমান ৮:৩০ ঘটিকার সময় সেনাবাহিনীর লোকজন আসে। জালাল উদ্দিন(পি.ডব্লিউ-৭), পৌরসভার চেয়ারম্যান কামাল হোসেন (পি.ডব্লিউ-২১) এবং পুকুরের মালিক মুজিবুল হক (পি.ডব্লিউ-২২) সাক্ষ্য দিয়ে এজাহারকারী (পি.ডব্লিউ-১) ও চা দোকানদার (পি.ডব্লিউ-২) বদিউজ্জামান এর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। এ মামলায় খুবই গুরুত্বপূর্ন সাক্ষী হলো চা দোকানদার (পি.ডব্লিউ-২) বদিউজ্জামান যিনি ঘটনাটি প্রথমে প্রত্যক্ষ করে উপরোক্ত সাক্ষীদের নিকট উহা বর্ণনা করেন। তার বর্ণনাকে সমর্থন করে কোঠালীপাড়া শেখ লুৎফর রহমান সরকারী কলেজের নৈশপ্রহরী পি.ডব্লিউ-৭ মো: জালাল উদ্দিন শাহ তার জবানবন্দীতে বলেছেন যে, গত ২০.০৭.২০০০ ইং তারিখে ফজর নামাজ শেষে ভোর অনুমান ৬:০০ টার সময় তিনি বদিউজ্জামানের চায়ের দোকানে চা খেতে গেলে বদিউজ্জামান তাকে পুকুরের পানিতে ২ টি বৈদ্যুতিক তার দেখেছেন বলে জানান এবং পুকুর ঘাটে গিয়ে দেখান। উক্ত তারের এক প্রান্ত দক্ষিণ ও অপর প্রান্ত উত্তর দিকে বিস্তৃত ছিল। ইতিমধ্যে পৌরসভার চেয়ারম্যান কামাল হোসেন সেখানে আসলে তিনিও বদিউজ্জামানের কাছ থেকে বিষয়টি জানেন এবং দেখেন। তখন চেয়ারম্যান উক্ত তারের কথা থানা কর্তৃপক্ষকে জানায়। রাত অনুমান ৮: ৩০ ঘটিকার সময় সেনাবাহিনীর লোক এসে উক্ত তারের সূত্র ধরে ঘটনাস্থল থেকে বোমা উদ্ধার করেন এবং গত ২৩.০৭.২০০০ ইং তারিখে কোটালীপাড়া হ্যালিপ্যাডের সামনে থেকে আরও একটি বোমা উদ্ধার করা হয়। গত ২২.০৭.২০০০ ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কোটালীপাড়া সরকারী কলেজ মাঠে একটি সভায় অংশগ্রহণ করার কথা ছিল। এ সাক্ষী পরবর্তীতে জানতে পারেন যে, আসামী মুফ্তি হান্নান ও তার সহযোগীরা প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীদেরকে হত্যা করার জন্য এবং সরকারী যানবাহন, হেলিকপ্টার, হ্যালিপ্যাড ইত্যাদি ধবংস করার জন্য উক্ত বোমা পুঁতে রেখেছিল। পি.ডব্লিউ-২১

পৌরসভার চেয়ারম্যান কামাল হোসেন তার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, চায়ের দোকানদার বদিউজ্জামান পুকুর ঘাটে বৈদ্যুতিক তার দেখার বিষয়ে তাকে জানান এবং তিনি বিষয়টি অবলোকন করে টেলিফোনে থানা কর্তৃপক্ষকে জানান। দুপুর অনুমান ১:০০ ঘটিকার সময় তিনি পুনরায় বদিউজ্জামানের চায়ের দোকানের কাছে এসে এসএসএফের কর্নেল হাবিব, কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এসআই নুর হোসেনসহ আরও অনেককে দেখতে পান। ঐ সময় কর্নেল হাবিব তাকে জানান যে, পুকুরঘাটের পানিতে তারের সূত্র ধরে বদিউজ্জামানের দোকানের পাশে মাটির নীচ থেকে একটি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তীতে গত ২৩.০৭.২০০০ ইং তারিখ হ্যালিপ্যাডের পাশে আরও একটি বোমা পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলের পাশের পুকুরের মালিক পি.ডব্লিউ-২২ মুজিবুল হক তার জবানবন্দীতে বলেছেন যে, পুকুর ঘাটের পানিতে বৈদ্যুতিক তার দেখার বিষয়ে সাক্ষী বদিউজ্জামান তাকে জানিয়েছে। ঐ দিনই রাত অনুমান ৮:৩০ ঘটিকার সময় সেনাবাহিনীর লোক ঘটনাস্থলে এসে একটি বোমা উদ্ধার করে এবং গত ২৩.০৭.২০০০ ইং তারিখে হ্যালিপ্যাডের কাছ থেকে আরও একটি বোমা উদ্ধার করা হয়। পি.ডব্লিউ-১০ শেখ হাবিবুর রহমান তার জবানবন্দীতে বলেছেন যে, গত ২০.০৭.২০০০ ইং তারিখ সকাল বেলায় তিনি জানতে পারেন যে, আদর্শ সরকারী কলেজের সন্নিকটে বদিউজ্জামানের চায়ের দোকানের পাশে পুকুরের পানিতে বৈদ্যুতিক তার পাওয়া গিয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে এসপি, ডিসি, ডিজিএফআই এর লোকজনকে দেখতে পান। সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দল রাত্রে এসে ঐ স্থান থেকে বোমা উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে গত ২৩.০৭.২০০০ ইং তারিখে কোটালীপাড়া হ্যালিপ্যাডের কাছে আরও একটি বোমা পাওয়া যায়। পি.ডব্লিউ-২৯ এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন সর্দারও তার জবানবন্দীতে ২ টি বোমা উদ্ধারের বিষয়ে উপরোক্ত সাক্ষীদের অনুরুপ বক্তব্য প্রদান করে বলেন যে, উক্ত ঘটনার পূর্বে ১৯৯৯ সনের ২৫শে এপ্রিল গোপালগঞ্জ পৌর পার্কে এক সভায় আবু জাফর হাসেমী ও মুফ্তি হান্নান সহ অনেকেই তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে বক্তব্য প্রদান করেন। তারা সবাই ঐ দিন থেকে তালেবান হিসেবে ঘোষনা দেন।

সেনাবাহিনী কর্তৃক উদ্ধারকৃত বোমাটি ৪০ কেজি ওজনের ছিল যার ব্যাস ১৬″ ডায়া ৪″,

উচ্চতা ১১ ইঞ্চি । উহা একটি লোহার ড্রামের মত -যার পুরত্ব ৮ মি:মি:। মুখ ঢালাই করা ড্রামের মধ্যে থেকে ৩ টি তার বাইরে গিয়েছে এবং ২টি তারের সাহায্যে বোমা ফাটানোর ব্যবস্থা ছিল। এই শক্তিশালী বোমাটি পি.ডব্লিউ-১ জব্দ তালিকামূলে জব্দ করে এবং তা

প্রদর্শনী ২ হিসেবে প্রমান করেন। পি.ডব্লিউ-১ তার জবানবন্দীতে বর্ণনা করেন যে, তিনি জব্দকৃত আলামত সেনাবাহিনীকে বুঝিয়ে দেন। জব্দ তালিকার সাক্ষী অহিদুল ইসলাম হাজরা পি.ডব্লিউ-৫০ তার জবানবন্দীতে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, গত ২৩.০৭.২০০০ ইং তারিখ রাত ৯:৪৫ ঘটিকায় তাদের উপস্থিতিতে কবি সুকান্ত সেবা সংঘের সামনে থেকে উদ্ধারকৃত বোমার জব্দ তালিকায় তিনি সাক্ষী হিসেবে ২নং প্রদর্শনী চিহ্নিত জব্দ তালিকায় স্বাক্ষর প্রদান করেছেন। তিনি তার স্বাক্ষর প্রমান করেন যা প্রদর্শনী ২/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যিনি এ মামলায় প্রথম তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন, তিনি পি.ডব্লিউ-৫৯ হিসেবে এ মামলায় জবানবন্দীতে বলেন যে, গত ২৩.০৭.২০০০ ইং তারিখ কোটালীপাড়া কলেজ মাঠ সংলগ্ন হ্যালিপ্যাডের পাশে পাকা রাস্তার পূর্ব পাশে কাঁচা মাটি থেকে প্রদর্শনী ৭ চিহ্নিত জব্দ তালিকায় আলামতের বর্ণনার ১নং ক্রমিকে ৭৬ কেজি ওজনের বোমা এবং ২ থেকে ৪নং ক্রমিকের আলামত সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ করে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেছেন। উক্ত জব্দ তালিকা (প্রদর্শনী-৭) এবং প্রস্তুতকারী হিসেবে তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী ৭/৩) প্রমান করেন।

পি.ডব্লিউ-৪৯ মো: হাবিবুর রহমান তার জবানবন্দীতে বলেন যে, সেনাবাহিনী কোটালীপাড়া হ্যালিপ্যাডের পাশ থেকে বোমা উদ্ধার করেছে। পুলিশ তার সামনে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করে এবং উহাতে তার স্বাক্ষর নেয়। উক্ত জব্দ তালিকা প্রদর্শনী ৭ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই সাক্ষী তার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী-৭/১) প্রমান করেন। পি.ডব্লিউ-৫৩ মো: আতিউর রহমান কোটালীপাড়াস্থ হ্যালিপ্যাডের সামনে থেকে উদ্ধারকৃত বোমার জব্দ তালিকার সাক্ষী। তিনিও পি.ডব্লিউ-৪৯ এর বক্তব্য সমর্থন করে জবানবন্দী প্রদান করেন এবং জব্দ তালিকায় তার স্বাক্ষর প্রমান করেন যা প্রদর্শনী-৭/২ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এই সাক্ষী উল্লেখ করেন যে, একটি কাঠের বাক্সের ভিতর ও একটি লোহার ড্রামের ভিতর বোমা ছিল এবং পাশে কালো ছাইয়ের মত কিছু পোড়া এবং নীল রং এর কিছু দিয়ে মোড়ানো ছিল। এর উপরে ৪টি তার বের করা ছিল এবং তারের সঙ্গে ২টি ‘‘Olympic Gold’’ ব্যাটারী সংযুক্ত ছিল। আর কিছু তার একটা হলুদ ও একটা লাল রঙের এবং ঐ তার চিকন এবং অনেক লম্বা ছিল।

এজাহারের বর্ণনা এবং উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গত ২০.০৭.২০০০ ইং তারিখে প্রথম ঘটনাস্থল থেকে প্রদর্শনী ২ চিহ্নিত আলামত

এবং গত ২৩.০৭.২০০০ ইং তারিখে হ্যালিপ্যাড সংলগ্ন সিঁড়ি বরাবর পাকা রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে কাচা মাটি থেকে প্রদর্শনী ৭নং চিহ্নিত আলামত উদ্ধার পূর্বক জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। জব্দ তালিকায় মানিত সাক্ষীগন স্থানীয় বাসিন্দা-যাদের উপস্থিতিতে উপরোক্ত আলামত অর্থাৎ বোমাদ্বয় উদ্ধার করা হয়-যা তারা একে অপরের সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থন পূর্বক প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রদর্শনী ২ ও ৭ চিহ্নিত আলামত প্রসঙ্গে আসামীপক্ষের বক্তব্য হলো রাষ্ট্রপক্ষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোটালীপাড়া সফরের সময় পুলিশসহ তার সফরসঙ্গীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়ে ভিত্তিহীন জব্দ তালিকা তৈরী করে কাল্পনিক আলামত সৃষ্টি করেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা আইন পাসের নিমিত্তে নিজ নির্বাচনী এলাকাকে নিরাপদ স্থান মনে করে যোগসাজসে বোমা উদ্ধারের মিথ্যা ঘটনা সৃষ্টি করে আসামীদেরকে অভিযুক্ত করেছে। আসামীদের এধরনের দাবি উপস্থাপনের পিছনে কোন যৌক্তিকতা আছে মর্মে দৃশ্যমান প্রমান খুজে পাওয়া যায় না। কারন, এজাহারকারী কিংবা তদন্তকারী কর্মকর্তার সাথে আসামীদের পূর্ব শত্রুতা ছিল এরকম কোন সাক্ষ্য আসামীপক্ষ উপস্থাপন করতে পারেনি। এ মামলায় অভিযুক্ত আসামীরা একেক জন একেক জায়গার অধিবাসী। তাদের সাথে রাষ্ট্রের কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে পূর্বাপর কোন শত্রুতা ছিল এ ধরনের সাক্ষ্য এ মামলায় দেখা যায় না। তাছাড়া আসামীপক্ষের জেরার উত্তরে পি.ডব্লিউ-১ বলেছে যে, মুফ্তি হান্নান মুন্সী ও আনিসদের সাবান ফ্যাক্টরী থেকে যে বোমা তৈরীর সরঞ্জাম আলামত হিসেবে উদ্ধার ও জব্দ করা হয়েছে তার সাথে উদ্ধারকৃত বোমা দুটির মিল রয়েছে। এই সাক্ষী আরো বলেন যে, গত ২০.০৭.২০০০ ইং তারিখে ২য় বোমাটি উদ্ধার করতে পারেনি। উহা উদ্ধার হয় গত ২৩.০৭.২০০০ ইং তারিখে। এই সাক্ষীকে এরুপ জেরা করে তার অভিযোগটি প্রমান করতে আসামী পক্ষ সহযোগীতা করেছে বলে প্রতীয়মান হয়। পি.ডব্লিউ-২ আসামী পক্ষের জেরার জবাবে তাদের প্রদত্ত সাজেশন অগ্রাহ্য করে স্বীকার করে বলেন যে, বৈদ্যুতিক তার ও বোমা উদ্ধারের পর তিনি পুলিশ প্রহরায় ছিলেন। ইহা কোন সাজানো নাটক ছিলো না। তার এ সাক্ষ্য দ্বারা পরিষ্কার হয় যে, এই সাক্ষীকে তাদের হেফাজতে নিয়ে পুলিশ একটি দ্বায়িত্বশীল কাজ করেছে নতুবা তার জীবন বিপন্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। পি.ডব্লিউ-১০ আসামী পক্ষের সাজেশন অগ্রাহ্য করে বলেন যে, আসামী তারেক আটক হওয়ার পর সে তার এবং অন্যান্যদের উপস্থিতিতে সংঘটিত ঘটনার বিষয় স্বীকার করেন এবং বোমা পোঁতার স্থান দেখিয়ে দেয়। পি.ডব্লিউ-২১ জেরার জবাবে বলেন যে, তিনি বোমা ২টি উদ্ধারের সময় উপস্থিত ছিলেন।

পৌর চেয়ারম্যান হিসেবে স্থানীয় পুলিশ এবং প্রশাসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য যথাযথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিল তা সত্য নয়। উক্ত জেরার ধরন দেখে প্রতীয়মান হয় যে, বোমা উদ্ধারের ঘটনা সত্য। উক্ত সাক্ষী পৌরসভার চেয়ারম্যান। তিনি বা পুলিশ ও প্রশাসন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের কি ধরনের ব্যর্থতা ছিল আসামী পক্ষ তা জেরার মাধ্যমে উক্ত সাক্ষীর কাছ থেকে পরিষ্কার করতে পারেননি। বোমা পোঁতা ও উদ্ধারের ঘটনা সাজানো নাটক বলে অহেতুক কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে জড়ানোর ব্যাপারে প্রশাসনের কোন ধরনের উদ্দেশ্য আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। কারণ আসামীগনের সাথে ঘটনার পূর্বে তাদের কোন পূর্বশত্রুতা ছিল সেমর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায়নি। বোমার সাথে সংযুক্ত বৈদ্যুতিক তার যে পুকুরে দেখা যায় তার মালিক পি.ডব্লিউ-২২ আসামী পক্ষের জেরার জবাবে বলেন যে, আসামী তারেককে আটক করে বোমা উদ্ধারের যে স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আসামী তারেক কোন দিনও তার সামনে বা পুলিশের সামনে বোমা তৈরী, বহন বা স্থাপন করার কথা স্বীকার করেনি তা সত্য নয়। এই সাক্ষীর জেরার জবাব দ্বারা প্রমান হয় যে, বোমা উদ্ধারের বিষয়ে প্রসিকিউশনের অভিযোগ সত্য। পি.ডব্লিউ-২৯ জেরার উত্তরে বলেন যে, ইহা সত্য নয় যে, গোপালগঞ্জ পৌর পার্কে ১৯৯৯ সনের ২৫শে এপ্রিল মুফ্তি হান্নানসহ আরো উপস্থিত বক্তারা যখন নিজেদেরকে তালেবান হিসেবে ঘোষনা করেন তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না এবং আসামী তারেক কোনদিনও তার সামনে ঘটনাস্থলে এ মামলার বোমা পোঁতার বিষয়ে কোন কিছু বলেনি বা কোন কিছু দেখায় নি। রাষ্ট্রীয় বা জনস্বার্থে আইন প্রনয়ন করেন আইন প্রনেতারা। এর সাথে বোমা উদ্ধারের ঘটনা সম্পৃক্ত করার যৌক্তিক কারণ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয় না এবং এ মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান আসামীপক্ষ বিচারিক আদালতে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা আইন পাশ করার নিমিত্তে আসামীপক্ষের দাবি মতে অহেতুক মানুষকে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় জড়িত করার উদ্দেশ্যও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ দাবি অপ্রমানিত হলে আসামীরা যে শাস্তি পাবে তাও সঠিক নয়। সুতরাং এ ধরনের দাবি বা সাজেশন উত্থাপন অবাঞ্চিত ও অপ্রাসঙ্গিক ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রদর্শনী ২ ও ৭ চিহ্নিত আলামত উদ্ধারের ঘটনা প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত হয়েছে। সর্বোপরি মামলার ঘটনার সময়, স্থান ও বিবরণ রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীগন পরস্পর একে অপরকে সমর্থন করে সাক্ষ্য দিয়ে প্রমান করেছেন মর্মে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হলো, প্রসিকিউশনের দাবি মতে প্রদর্শনী ২ এবং ৭ চিহ্নিত জব্দ তালিকায় বর্ণিত আলামতগুলো আদৌ বোমা নাকি আসামী পক্ষের দাবি মতে কাল্পনিক কোন বস্তু ? সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী উদ্ধারকৃত বোমা ২টি সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দলের নিকট হস্তান্তর করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা মুন্সী আতিকুর রহমান বোমা দুটির পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করেন এবং তিনি পি.ডব্লিউ-৬৩ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। সেনাবাহিনীর চীফ অফ জেনারেল স্টাফ এর পক্ষে মেজর জেনারেল হাবিবুর রহমান পি.ডব্লিউ-৬১ হিসেবে এ মামলায় সাক্ষ্য প্রদান করে তার জবানবন্দীতে বলেছেন যে, ২০০০ সনের ২০ ও ২৩ জুলাই তিনি আর্মি হেডকোয়ার্টারে অপারেশন ডাইরেক্টরেট জি-১ (গ্রেড-১) স্টাফ অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকা কালে যশোর এরিয়ার ৫৫ পদাতিক ডিভিশন থেকে বোমা ডিসপোজাল সংক্রান্ত Army Headquarters থেকে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তৎকালীন আইজিপি সেনাবাহিনীর প্রধানকে ঐ প্রতিবেদনের একটি কপি প্রেরণের অনুরোধ করেন। সেই প্রেক্ষিতে প্রতিবেদনটি ১২ ডিসেম্বর ২০০০ ইং তারিখে তৎকালীন আইজিপির নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রতিবেদনটি ছিল ২০ ও ২৩ জুলাই ইং তারিখে উদ্ধারকৃত ০২ টি বোমা সংক্রান্ত যা Improvised Explosive Devices [IEDs] । তিনি প্রতিবেদনটিতে স্বাক্ষর প্রদান করে তা প্রেরণ করেন-যা প্রদর্শনী ১৯ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে- যার মধ্যে তার ০২ টি স্বাক্ষর প্রদর্শনী ১৯/২ হিসেবে প্রমান করেন। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনায় দেখা যায়, সেনাবাহিনীর বোমা বিশেষজ্ঞদল বোমা দুটি পরীক্ষান্তে বোমা তৈরীর বিষয়, বোমার কাঁচামাল, ডেটোনেটর, ড্রাম এবং উহার ওজন, প্রস্তুত পদ্ধতি, বোমা পোঁতার স্থান, প্ল্যান ইত্যাদি বর্ননা করে প্রতিবেদন দিয়েছেন। উক্ত বোমা দুটির পরীক্ষার বিশেষজ্ঞ মতামত নিম্নরুপ:

"IED-1. The IED-1 was placed at the shoulders of road situated near the road Sheikh Lutfor Rahman College where the stage was prepared for Hon'ble Prime Minister's address on 22 July 2000. In case it ignited during the public Meeting of Hon'ble Prime Minister, the people gathered in the venue would have been killed/injured by detonation /shocked.

However, after detail study and experiment carried out on the destruction effect of the IED, it is assumed that, a radius of one km area would have been affected by this detonation and huge loss of life and property would have taken place. A hazardous area beyond one km is assumed. It is further assumed that a cratering effect of 9'-5″ depth with 34' radius on the top surface of the ground could have taken place at the site of explosive.

IED-2. The IED-2 was placed very close to helipad at the shoulder of the road which is also close to the venue of Hon'ble Prime Minister's address on 22 July 2000 at Sheikh Lutfor Rahman College ground. This IED is having grosser weight than IED-1 and could have caused more devastating effect than that of IED-1. Drop zone is assumed to be one Km and hazardous area is assumed to be beyond that. It is further assumed that, cratering effect of 9'-5″ depth with 34' radius on the top surface of the ground could have taken place at the site of explosive."

"Both the IEDs were planned to explosive in similar fashion. IEDs contain a detonator with Improvised high explosive contents and anti lifting device which is connected with four one core copper wires duly insulated. These wires originate from IEDs body landing out side of IEDs body through thin perforated holes in the centre of the IED body. A length of 50 [Fifty] yard thin coloured wire went out side of IEDs body, which appeared to be laid for, undetected initiation. Method of initiation such as exploder dynamo or charge dynamo on indigenously prepared similar initiator was not found at other end of the wires."

উপরোক্ত বোমা ২ টির ব্যাপারে বিশেজ্ঞদের প্রতিবেদন বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, যদি ঐ দুটো বোমা মিটিং চলাকালে অর্থাৎ মানুষের সমাগমের সময় বিস্ফোরিত হতো তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ উপস্থিত লোকজন এবং আশে পাশের ঘর-বাড়ী মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অনেক লোকের প্রাণহানীর সমূহ সম্ভাবনা ছিল। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ আছে যে, ঐ দুটো বোমার মধ্যে একটি বিস্ফোরিত হলেও ঘটনাস্থল থেকে ১ কিলোমিটার ব্যাপী মারাত্বকভাবে ধ্বংলীলায় পরিনত হতো এবং প্রায় সাড়ে ৯ ফুট মাটির গভীরে আঘাত হানত এবং উহা মাটি থেকে প্রায় ৩৪ ফুট উপর পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।

বোমা বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ২ টি বোমা বিশেষ কায়দায় এবং বিশেষ বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা তৈরী করা হয়েছে- যাতে মারাত্বকভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকাটি ধবংসলীলায় রুপ নিতে পারে। এ মামলার এজাহারে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন আসামীর নাম উল্লেখ নেই। বাদী এস,আই মো: নুর হোসেন মামলাটি থানায় ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪ ধারা তৎসহ ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(ঘ) ধারায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রুজু করেন। এটা সত্য যে, ঘটনাস্থলে বোমা স্থাপনের বিষয়ে প্রত্যক্ষ কোন সাক্ষী এ মামলায় নেই। তবে তদন্তকালে কয়েকজন আসামী, তার মধ্যে মো: আনিসুর রহমান ওরফে আনিস, আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মেহেদি হাসান ওরফে গাজী খান, মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে ওয়াসিম আক্তার এবং সারওয়ার হোসেন মিয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা অনুযায়ী উক্ত বোমা পুঁতে রাখার বিষয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে।

সংঘটিত ঘটনার প্রধান আসামীদের মধ্যে আসামী মুফ্‌তি আব্দুল হান্নান মুন্সী রমনা থানার মামলা নং-৪৬ তারিখ ১৪/০১/২০০১ ইং এর একজন আসামী। উক্ত রমনা থানার মামলায় মুফ্‌তি আব্দুল হান্নান ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে। উক্ত জবানবন্দীতে কোটালীপাড়ায় বোমা তৈরী ও বোমা বিস্ফোরনের উদ্যেশ্যে ষড়যন্ত্র এবং উক্ত ২ টি বোমা পোঁতার ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ননা দিয়েছে। তাছাড়াও এ মামলায় অনেক পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য (Circumstantial Evidance) রয়েছে-যা এ মামলায় অনেক গুরুত্ব বহন করে। এমনকি মুফ্‌তি হান্নানের কোটালীপাড়ার সাবান ফ্যাক্টরীর কর্মচারী মুরাদ হোসেনের সাক্ষ্য এ মামলায় খুবই গুরুতপূর্ণ।

নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আসামী আনিসুল ইসলাম এর দোষ স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দী ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মো: রফিকুল ইসলাম লিপিবদ্ধ করেছিলেন। উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী তিনি পি.ডিব্লউ-৫৪ হিসেবে প্রমান করেন যা-প্রদর্শনী ১১ হিসেবে চিহ্নিত হয়। তিনি তার জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, তিনি বিধিবিধান প্রতিপালন পূর্বক আসামীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন। আসামী আনিসুল ইসলামের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-১১) তে উল্লেখ আছে যে, সে ঠিকাদারীর পাশাপাশি তার বন্ধু এনামুল হক মিন্টুকে সাথে নিয়ে গোপালগঞ্জে বিসিক শিল্প নগরীতে ১৯৯৭ ইং সনে একটি প্লট বরাদ্দ নিয়েছিল। টাকার অভাবে প্লটটিতে বিল্ডিং এর কাজ সম্পন্ন করতে না পারায় ১৯৯৯ ইং সনে তার ভাই মুফ্তি হান্নান ও তার বন্ধু ইউসুফ বিল্ডিং এর কাজ সম্পন্ন করে ব্যবসা করবে এবং শেয়ার দিবে মর্মে আশ্বাস দিলে তাতে সে সম্মতি জানায় এবং মুফ্তি হান্নান ও ইউসুফ সেখানে বিল্ডিং নির্মান করে সাবানের ব্যবসা শুরু করে। মুফ্তি হান্নান ও ইউসুফ উভয়েই ছিল কারখানার পরিচালক আর তার ছোট ভাই মহিবুল্লা ও চাচাতো ভাই ইব্রাহিম হিসাব-কিতাব এর কাজ করতো। প্লট যেহেতু তার নামে সেহেতু অফিসিয়াল যোগাযোগ তাকেই করতে হতো এবং মাঝে মাঝে সে কারখানায় যাতায়াত করতো। ২০০০ ইং সালের জুন মাসের শেষে কিংবা জুলাই মাসের প্রথম দিকে একদিন কারখানায় গিয়ে সে দেখতে পায় যে, তার ভাই মুফ্তি হান্নান, ইউসুফ, মাও: জাকির, নুর ইসলাম, হাসান, মাহমুদ, তারেক গাজী, আহাদ, শাহনেওয়াজ, লোকমান, খোকন মিলিত হয়ে ভিতরে মিটিং করছে। তার উপস্থিতি দেখে সকলে আলোচনা বন্ধ করে দেয়। সে ইতিমধ্যেও একদিন কারখানায় গিয়ে তিনটি প্লাস্টিকের বস্তায় কিছু মালামাল দেখে নুর ইসলামকে জিজ্ঞেস করলে নুর ইসলাম বলেছিল এগুলো কেমিক্যাল। সাবান তৈরীর কারখানায় এ ধরনের জিনিস দেখে তার সন্দেহ হয়। জিজ্ঞেসায় ইউসুফ তাকে জানায় এগুলো তাদের কাজে লাগবে। কারণ এগুলো দিয়ে বোমা বানানো হবে। মিটিং এর বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে ইউসুফ মুফ্তি হান্নানকে ডাকে। তখন তারা তাকে বলে দেশে মহিলা নেত্রী। তা ইসলাম সম্মত নয়। তা প্রতিহত করতে হবে। তাদের হরকাতুল জিহাদের আমীর মো: ইব্রাহিমসহ হরকাতুল জিহাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টুঙ্গী-পাড়ায় অথবা কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ নাশের চেষ্ঠা করবে। সে এর প্রতিবাদ করায় তাকে বুঝানোর চেষ্টা করে এবং অবশেষে নানারকম ভয়-ভীতি দেখায়। তাদের প্ল্যান সম্পর্কে কাউকে কিছু বললে তাকে মেরে ফেলবে। এর কিছু দিন পর তার

ভাই মুফ্তি হান্নান তাকে বলে যে, তাদের কারখানায় তৈরীকৃত সাবান কোটালীপাড়া রাখার জন্য একটি ঘর দরকার। কারণ ঐখান থেকে ছেলেরা বিভিন্ন দোকানে সাবান বিক্রি করবে । উক্ত কথার প্রেক্ষিতে সে অগ্রীম ২০০০ টাকা দিয়ে তার ভগ্নীপতি সারওয়ার হোসেনের মাধ্যমে তার চাচাতো ভাই জাকিরের ঘরটি ভাড়া করে দেয়। এরপর সোনার বাংলা ক্যামিকেল ইন্ডাষ্ট্রি থেকে সাবান নিয়ে ভাড়া করা জাকিরের ঘরে রেখে নুর ইসলাম, হাসান, মাহমুদ, ড্রাইভার রাশেদ বিভিন্ন বাজারে সাবান বিক্রি করতো। ২২ জুলাই/২০০০ ইং তারিখে প্রধানমন্ত্রী কোটালীপাড়ায় আগমনের সংবাদ তার ভাই মুফ্তি হান্নানসহ অন্যান্যরা আগে থেকেই জেনে ফেলে। জুলাই মাসের প্রথম দিকে সে সাবান কারখানায় গিয়ে বিভিন্ন রকমের তার ও কিছু কার্টুন দেখতে পায়। এ বিষয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। ১৯ জুলাই/২০০০ ইং সন্ধ্যা বেলায় সে, মিজান, বাচ্চু ও দীপু বালিয়াডাঙ্গা বাচ্চুদের বাড়ী থেকে আসার পথে কোটালীপাড়ায় সুয়ো গ্রাম রোডের মোড়ে মতির দোকানের সামনে ৯৯৬১ নং ঢাকা মেট্রো:-গ কার টি নীল পলিথিনে ঢাকা অবস্থায় দেখতে পায়। তারা সামনের দিকে হাসপাতালের কাছে হাওলাদার ফার্মেসীর দিকে যাওয়ার পথে তার ভাই মুফ্তি হান্নানের ভাড়া করা জাকিরের ঘরের ভিতর ড্রাইভার রাশেদ, হাসান, নুর ইসলাম, গাজী, মাহমুদ ও খোকনকে দেখতে পায়। হাওলাদার ফার্মেসীতে আড্ডা মেরে রাত ১০:০০ ঘটিকা থেকে রাত ১০:৩০ ঘটিকার দিকে তারা ব্র্যাক অফিসের দিকে যাওয়ার পথেও জাকিরের ঘরে লোকজন আছে বুঝতে পারে। ব্র্যাক অফিসের সামনে রাত ১২-১২:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত আড্ডা মেরে যার যার বাড়ী যাওয়ার সময় তার ভাই মুফ্তি হান্নান ও ইউসুফকে মোটর সাইকেলে নীল পলিথিনে মোড়ানো গাড়ীর সামনে আসতে দেখে তার সন্দেহ হয়। তখন সে ইব্রাহিমকে ডেকে জিজ্ঞেস করে তারা এত রাতে ঐখানে কি করছে। ইউসুফ গাড়ীর ভিতরে ২টি বোমা থাকার কথা স্বীকার করে । তখন তাদের পূর্ব পরিকল্পনার কথা তার মনে পড়ে যায়। সে তখন তাদেরকে ঐ কাজ করতে নিষেধ করলে তারা তাকে ভয়-ভীতি দেখায় এবং ঐ রাতে তাকে কোথাও যেতে নিষেধ করে। এ কথা বলার সাথে সাথেই নুর ইসলাম, ড্রাইভার রাশেদ ও হাসান গাড়ীর কাছে চলে আসে। গাড়ীটি ও মোটর সাইকেল নিয়ে তারা কলেজের দিকে চলে যায় এবং সে বাসায় চলে আসে। পরের দিন সকাল বেলায় বোমা পোঁতাবস্থায় পাওয়া যায়। এরপর ২০ ও ২১ জুলাই বোমার প্রতিবাদে তারা মিছিল বের করে। ২১ জুলাই মিছিল শেষে বাসায় ফেরার পথে মাহমুদ ও গাজীর সাথে রেষ্ট হাউজের সামনে দেখা হয়। তখন এ বিষয়ে তাদেরকে

জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা বলে যে, একটি তো বের হয়েছে অন্য বোমাটি জীবন দিয়ে হলেও ব্লাস্ট করবে। সে তাদেরকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের ভয় দেখিয়ে ভেগে যেতে বলে। পরে সেও পালিয়ে রামপাল চলে যায়। সেখান থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং সে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেছে বলে উল্লেখ করে।

ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এ, কে আব্দুস সালাম পি.ডব্লিউ-৫৬ হিসেবে এ মামলায় সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি আসামী আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে গাজী খান এবং আসামী মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে ওয়াসিম আক্তার এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে লিপিবদ্ধ করেছেন। আসামী আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে গাজী খান স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রর্দশনী-১৩) এবং মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে ওয়াসিম আক্তারের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-১৪) তিনি প্রমান করেন যা প্রদর্শনী হিসেবে চিহ্নিত হয়। বর্নিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীদ্বয়ে প্রদেয় তার স্বাক্ষর এবং আসামীদের স্বাক্ষর সনাক্ত করে প্রমান করেন। তিনিও যথাযথ নিয়ম ও বিধিবিধান মেনে আসামীদ্বয়ের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছেন বলে উল্লেখ করেন।

প্রদর্শনী-১৩ পর্যালোচনায় দেখা যায় উক্ত জবানবন্দীতে দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মেহেদি হাসান ওরফে গাজী খান বলেছে যে, গত রমজান মাসের কিছু দিন আগে মোহাম্মদপুর রহমানিয়া মাদ্রাসায় ভর্তির জন্য গেলে মূফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সির সাথে তার দেখা হয়। উক্ত আব্দুল হান্নান মুন্সীকে সে রহমানিয়া মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া শেষ করে আফতাব উদ্দিন মাদ্রাসায় যাওয়ার প্রায় ৬(ছয়) মাস পূর্ব হতে চেনে। তার নাম ছিল আবুল কালাম। উক্ত আবুল কালাম মাদ্রাসার বিভিন্ন ছাত্রদের কাছে আসতো। রহমানিয়া মাদ্রাসার কাছে সাত মসজিদে একদিন মূফতি হান্নান মুন্সি আছরের নামাজের পর ঐ মাদ্রাসায় ১০/১৫ জন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বয়ান করে। সেখানে কোরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে বিভিন্ন ইসলামী যুদ্ধে অংশগ্রহনের জন্য বয়ান করে। আফগানিস্তানের মোজাহিদগন বিভিন্ন দেশ থেকে এসে রাশিয়ান সৈন্যদের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করতো তা এবং কিভাবে সে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করেছে তা বর্ণনা করে মজলুম জনতার পাশে দাড়ানোর জন্য আহবান করে। সে ১৯৯৪ সালে মোহাম্মদপুর রহমানিয়া মাদ্রাসায় পড়ার সময় জাগো মোজাহিদ পত্রিকা পড়তো এবং এ পত্রিকাসহ অন্যান্য পত্রিকা বিক্রী করতো।

জাগো মুজাহিদ অফিসে মুফতি আব্দুল হাই এর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সে জাগো মুজাহিদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলো। সে হরকাতুল জিহাদ সংঠন করতো। এভাবে তার হরকাতুল জিহাদের সাথে সম্পর্ক হয়। এছাড়া খুলনার শেখ ফরিদের ভাই মুফ্তি সাদাতের সাথে মিরপুর মহিলা মাদ্রাসায় তার পরিচয় হয়। তার কাছেই জানতে পারে যে, ভাই শেখ ফরিদ বাংলাদেশ হরকাতুল জিহাদের সেক্রেটারী। গত রমজান মাসের পূর্বেই মুফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সীর সাথে দেখা হলে সে তাকে বলে মুফ্তি হান্নান সাবান ও মোমবাতির কারখানা করেছে। সেখানে সৎ ও নামাজি কর্মচারী দরকার। এরপর তারেকের সাথে মিরপুর দেখা হলে সে তারেককে বলে যে, মুফ্তি আব্দুল হান্নান ওরফে আবুল কালাম গোপালগঞ্জে একটি সাবানের কারখানা স্থাপন করেছে। সে ঐ সাবানের কারখানায় একজন মুজাহিদ, নামাজি এবং সৎ লোকের চাকুরী দিবে বলেছে। তাকে বলে যে, সেখানে গেলে চাকুরী পাবে। অনেক মুজাহিদ এবং তালেবান সেখানে আসে। সেখানে গেলে সকলের সাথে সাক্ষাত হবে। হান্নানের দেয়া ঠিকানা মতে সে ও তারেক গোপালগঞ্জে বিসিক শিল্প এলাকায় তার কারখানায় যায়। উক্ত কারখানার জমির মালিক হান্নানের ভাই আনিসুল ইসলাম। কারখানা তৈরী ও মালামাল কেনার সমুদয় টাকা খরচ করতো আবুল কালাম ওরফে মুফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সী। আবু ইউসুফ আবুল কালামের ঘনিষ্ট বন্ধু বলে তারা জানতো। আনিস মাঝে মাঝে কারখানায় আসতো এবং তাদের সাথে কথা-বার্তা বলতো। কারখানার ম্যানেজার ছিল আনিসের ছোট ভাই মহিবুল্লাহ ওরফে মফিজ এবং কারখানার বিক্রয় কর্মকর্তা ছিলো আনিসের চাচাতো ভাই ইব্রাহিম। উক্ত সাবান ফ্যাক্টরীর কর্মচারী হিসেবে সেসহ মুরাদ, আহাদ, আ: ওহাব ও দুলাল ছিলো। পরে দুলাল চাকুরী ছেড়ে চলে যায়। গেটে থাকতো নাঈম। অন্যদের মধ্যে মাহমুদ, নুর ইসলাম ওরফে ইসমাইল, ড্রাইভার রাশেদ, শাহনেওয়াজ, সাইফুল, হাসান কারখানায় ছিলো। এছাড়া ইউসুফ, লোকমান ও খোকন মাঝে মাঝে আসতো। এছাড়াও মাওলানা জাকির সাং ঘাগড়সহ অনেক হুজুর প্রায়ই আসতো এবং হান্নানের সাথে কথা-বার্তা বলে চলে যেত। ঘটনার অনুমান দেড় থেকে দুই মাস আগে ফরিদপুর থেকে কামাল উদ্দিন শাকের সাবান ফ্যাক্টরীতে মুফ্তি হান্নানের নিকট আসে এবং তার সাথে কথা-বার্তা বলে। সে যাওয়ার পরে ফরিদপুরে বোমা বিস্ফোরন হয় বলে শুনেছে। সেখানে একজন লোক মারা যায়। উক্ত সাবান কারখানায় মুফ্তি আব্দুল হান্নানের ভগ্নিপতি সারোয়ার নামে একজন আছে বলে জানে। দন্ডিত আসামী মেহেদী হাসান ওরফে গাজী খান আরো বলে যে, সাবান কারখানার

অফিস রুমে কারখানার মাঝখানে তারা থাকতো। অফিস রুম এবং সাবানের রুমে আহাদ, মুরাদ, আ: ওহাব থাকতো। বাকি সবাই অর্থাৎ মাহমুদ, নুর ইসলাম ওরফে ইসমাইল, রাশেদ, শাহনেওয়াজ, সাইফুল, হাসান, ইউসুফ, লোকমান পিছনের রুমে থাকতো। সেখানে মাঝে মধ্যে সবাই ব্যায়াম করতো। পিছনের রুমের পর্দা ঘেরা কিছু জায়গা ছিলো। উক্ত স্থানে প্লাস্টিকের ৩ টি বস্তায় সাদা বিস্ফোরক এনে জমা করে রেখেছিল। এর পর বোমা তৈরীর উপকরণ যেমন-বৈদ্যুতিক তার, ব্যাটারী, সুইচ ও ক্যামিক্যাল মাঝে মাঝে এনে জমা করে রাখে। তাকে কয়লা গুড়া করে রাখতে বললে সে সাবানের চুলা থেকে কাঠ এনে মোটর যুক্ত একটি মেশিনে গুড়া করে রাখতো। তাকে বলেছিল উহা দিয়ে দাঁতের মাজন তৈরী করবে। কিন্তু পরবর্তীকালে সেগুলো বোমা তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়। অন্যরা বোতল গুড়া করে রেখেছে বলে শুনেছে। এছাড়া বোমার জন্য ব্যবহৃত ড্রাম দুটি এবং ড্রামের ঢাকনা দুটি পিছনের রুমে এনে রেখেছিল। সে উক্ত ড্রাম আনার পর পিছনের রুমে প্রায়ই দেখেছে। বোমার ড্রামের মুখে প্যাচ কাটা ছিল।

এই আসামী আরো বলে যে, ১৪/১৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কোটালীপাড়া সফরের কথা প্রকাশ পায়। সফর ও কোটালীপাড়া সভার তারিখ ২২ জুলাই নির্ধারিত ছিল। ১৪/১৫ জুলাই তারিখের পর (২/৩ দিন পর) ইউসুফ, নুর ইসলাম ওরফে ইসমাইল, হাসান, মুফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সী পিছনের রুমে পর্দার আড়ালে বসে দুটি বোমা তৈরী করে ড্রামে ঢাকনা লাগিয়ে দেয়। বোমা তৈরীর পূর্বে ড্রিল মেশিন দিয়ে বোমা তৈরী ড্রামে ছিদ্র করতে বললে সে ও তারেক একটি ড্রামে তিনটি ছিদ্র করে এবং অপর ড্রামে তারেক ও ইউসুফ ছিদ্র করে। এরপর লোহার ড্রামের বোমা দিয়ে কি করবে জিজ্ঞেস করলে তাদের একটি প্রোগ্রাম আছে বলে তাকে জানায়।

এই আসামী স্বীকারোক্তিতে আরো বলে যে, বোমা কোটালীপাড়া নিয়ে যাওয়ার আগের দিন বোমার নীচে ব্যবহারের জন্য ইউসুফের কথায় ছোট ছোট করে কাঠের টুকরা বানিয়ে পিছনের ঘরে রাখে। কোটালীপাড়ায় যেদিন বোমা পাওয়া যায় তার আগের দিন আছরের কিছু সময় আগে সাইফুল আসে এবং আছরের নামাজের কিছু সময় পর ড্রাইভার রাশেদ সাদা প্রাইভেট কারটি সাবান কারখানার মাঝ বরাবর রাখে। তাকে অফিসের সামনে পাহারা দিতে বলে এবং কোন লোক আসলে সংবাদ দিতে বলে। তারেক, রাশেদ, হাসান দুটি বোমা গাড়ীর পিছনের ডালায় তোলে। ড্রাইভার রাশেদ, হাসান, নুর ইসলাম, সাইফুল ও তারেক উক্ত গাড়ীতে করে বের হয়ে যায়। ইউসুফ এবং মুফ্তি হান্নান পরে মোটর সাইকেল নিয়ে যায়। পরের দিন সকালে রাশেদ গাড়ী নিয়ে আসে। সাথে মুফ্তি হান্নান,

হাসান, নুর ইসলাম ও তারেক আসে। পরে ইউসুফ মোটর সাইকেলে আসে। বেলা অনুমান ১২:০০ ঘটিকার সময় কোটালীপাড়া থেকে সাইফুল ফেরত আসে। বোমার সাথে লাগানো তার চায়ের দোকানদার পেয়েছে এবং বোমার ঘটনা ফাঁস হয়েছে বলে জানায়। সাইফুল জানায় যে, কোটালীপাড়ার নেতারা থানায় ঘটনা জানিয়েছে। এ সময় নুর ইসলাম বলে কোটালীপাড়ায় যে বোমা পোঁতা হয়েছিল উহার বিস্ফোরন ঘটলে শুধু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই মারা যেত না, অনেক নিরীহ লোকও মারা যেত।

আসামী মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে ওয়াসিম আক্তার তার প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-১৪) তে অত্র মামলার ঘটনার বিবরনে তার সংশ্লিষ্টতা প্রসঙ্গে বলে যে, ৫/৬ মাস পূর্বে গাজীর কাছে জানতে পারে গোপালগঞ্জে তালেবানদের একটা সাবান ফ্যাক্টরী আছে। সেখানে গেলে চাকুরী পাওয়া যাবে। সেখানে অনেক মুজাহিদ এবং তালেবান আছে, তাদের সাথে দেখা হবে। তখন সে ও গাজী গোপালগঞ্জে আবুল কালামের সাবানের কারখানায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে জানতে পারে আবুল কালাম ওরফে মুফ্তি আব্দুল হান্নান একজন আফগান মুজাহিদ। গোপালগঞ্জে উক্ত কারখানায় যেয়ে মহিবুল্লাহ ওরফে মফিজকে চেয়ারে বসা দেখে। তার সাথে হাসান, নুর ইসলাম ওরফে ইসমাইল ও মাহমুদকে দেখে। মফিজ সেখানকার ম্যানেজার। তার কাছে তারা চাকুরী চায়। ম্যানেজার মফিজ তাকে লেবার এবং গাজীকে প্যাকিং এর চাকুরী দেয়। সে স্বীকারোক্তিতে আরো বলে যে, সাবান ফ্যাক্টরীতে কাজ করার সময় জানতে পারে আবুল কালাম কারখানার মালিক এবং আনিস কারখানার জমির মালিক। আনিস মাঝে মাঝে কারখানায় আসতো। তাদের সাথে কথা বলতো। কারখানায় যারা ছিলো তাদের মধ্যে মুফ্তি হান্নান ওরফে আবুল কালাম, নুর ইসলাম, সাইফুল, রাশেদ (ড্রাইভার), শাহনেওয়াজ, গাজী, মফিজ ওরফে মহিবুল্ল্যা, ইব্রাহিম মুন্সী, মুরাদ, আহাদ, ওহাব, দুলাল এবং সে ছিল অন্যতম। এছাড়া আরো সেলসম্যান ছিলো। তাছাড়া ইউসুফ, লোকমান, খোকন ও হাসান মাঝে মাঝে আসতো। ইউসুফ ও হাসান মাঝে মাঝে থেকে চলে যেত, আবার আসত। তাছাড়া মাওলানা ধরনের কিছু লোকও মাঝে মধ্যে সেখানে আসতো। সে যখন প্রথম যায় তখন অফিসের সামনে ৪ টি প্লাস্টিকের বস্তায় সাদা পাউডার জাতীয় পদার্থ ছিল। তাকে নুর ইসলাম বস্তাগুলো ভিতরে নিতে বললে সে বস্তাগুলো পিছনের রুমে নিয়ে রাখে। পিছনের রুমে কতখানি জায়গা পর্দা দিয়ে ঘেরা ছিল। পর্দার ভিতরে মুফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সী, নুর ইসলাম, হাসান, ইউসুফ সব সময় থাকতো। গাজী, রাশেদ, সাইফুল, মাহমুদ, শাহনেওয়াজ মাঝে মাঝে যেতো, সেও মাঝে মধ্যে

প্রয়োজনে সেখানে যেতো। সেখানে আহাদ ও মুরাদ আসতো। নামাজ পড়তো। আহাদ, মুরাদসহ অন্যান্যরাও অফিস রুমে থাকতো।সে কাজে যোগদান করার প্রায় ২ (দুই) মাস পর একটি গম ভাংগা, আটা বানায় ধরনের একটি মোটর যুক্ত মেশিন ও একটি সেলাই মেশিন আনে। উক্ত মেশিন আনার পর নির্দেশ মতে গাজী কয়লা গুড়া করে রাখে। পিছনের রুমের মধ্যে আরো একটি ছোট রুম ছিলো, সেখানে মেশিন চলার শব্দ শুনতো। নুর ইসলামকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে মেডিসিন মেশানো হচ্ছে। পর্দা ঘেরা রুমে বসে আব্দুল হান্নান মুন্সী, হাছান, নুর ইসলাম, ইউসুফ আলোচনা করতো। কোটালীপাড়ায় বোমা পাতার প্রায় এক মাস আগে খুলনা থেকে কারখানায় প্রাইভেট কারে অনুমান এক ফুট উঁচু দুটি ড্রাম আনে। উক্ত গাড়ীর ড্রাইভার ছিলো রাশেদ। হাছান তাকে ড্রাম দুটি নামিয়ে দিতে বললে সে ড্রাম দুটি নামিয়ে সাবানের গোডাউনে রাখে। ড্রামের ওজন প্রায় ২০ কেজি, ড্রামের সাথে দুটি ঢাকনাও ছিল। সেখান থেকে বোমা তৈরীর আগে ড্রাম দুটি পিছনের রুমে নিয়ে যায়। পর্দার রুমে বসে ইউসুফ তাতাল দিয়ে তারের সাথে পেন্সিল ব্যাটারীর কানেকশন দিতে থাকে। যেদিন বোমা নিয়ে কোটালীপাড়া যায় তার ১ (এক) দিন পূর্বে নুর ইসলাম তাকে ড্রিল মেশিন পর্দার বাহির থেকে ভিতরে নিতে বলে। ২টি ড্রামে তাকে ৩টি ছিদ্র করতে বলে। ভিতরে নিয়ে সে ও ইউসুফ একটি ড্রামে তিনটি ছিদ্র করে। অন্যটিতে সে ও গাজী তিনটি ছিদ্র করে। তার পর নুর ইসলাম, ইউসুফ, আবুল কালাম ওরফে মুফ্তি আবদুল হান্নান মুন্সী ও হাছান ড্রাম ২ টিতে ২টি বোমা তৈরী করে। সে হাছানকে জিজ্ঞেস করে এগুলো দিয়ে কি করবে? হাছান বলে ''প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খাওয়াব''। বোমা তৈরী করার সময় গাজীকে সাইজ করে দুটি কাঠ কাটতে বলে। তখন গাজী দুটি কাঠ সাইজ করে কেটে রাখে। বোমা দুটি ছালার বস্তায় ভরে রাখা হয়। গত ১৯/০৭/২০০০ ইং তারিখ মাগরিবের কিছু আগে হাছান তাকে একটি বোমা ধরতে বললে সে ও হাছান একটি বোমা নিয়ে প্রথমে সাবানের ষ্টোরে রাখে। সেখান থেকে বোমাটি হাছান, নুর ইসলাম ও সে অফিসের সামনে থাকা কারখানার সাদা গাড়ীর পিছনের ডালার মধ্যে রাখে। ঐ সময় মুরাদ গেটের কাছে এসে দেখে ফেললে তাকে ট্রান্সপোর্টে মাল এসেছে কিনা তা দেখার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরপর ড্রাইভার রাশেদ গাড়ী ব্যাক করে সাবানের কড়াইয়ের কাছে আনে। সেখানে অন্য বোমাটি রাশেদ, হাছান এবং সে গাড়ীর পিছনের ডালায় রাখে। মাগরিবের সময় হাছান, নুর ইসলাম, সাইফুল ও সে কোটালীপাড়ায় রওয়ানা হয়ে যায় এবং গাড়ী চালায় রাশেদ। কোটালীপাড়ায় ২২ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর সভায় তাঁকে হত্যার

উদ্দেশ্যে বোমা পোঁতার জন্য তারা বোমা নিয়ে যায়। কোটালীপাড়া যাওয়ার পথে বেশী লোক গাড়ীতে থাকলে পুলিশ সন্দেহ করতে পারে সেজন্য তাকে এবং হাছানকে ঘাগড় ব্রিজের আগে নামিয়ে দেয়া হয়। বাকীরা কোটালীপাড়ায় চলে যায়। তারা ঘাগড় ব্রিজ পার হয়ে একটা মসজিদে নামাজ পড়ে। তারপর হাটতে হাটতে কারখানার নামে ভাড়া করা দোকানে পৌঁছে যায়। সেখানে সাইফুল, রাশেদ ও নুর ইসলামকে পায়। রাত্রি অনুমান ১২:০০ টার সময় হাছান তাদের ডেকে নেয়। তারা দোকান থেকে বের হয়ে ২ জন করে হেটে কলেজের দিকে যেতে থাকে। কলেজের কাছে মুফ্তি আবদুল হান্নান মুন্সীর সাথে দেখা হয়। মুফ্তি হান্নান ও ইউসুফ মোটর সাইকেলে করে গিয়েছিল। তারা শাবল, কোদাল ও কয়লার গুড়া গাড়ীতে করে নিয়ে গিয়েছিল। কলেজের মাঠের উত্তর পূর্ব কোণায় রাস্তায় ইউসুফ, হান্নান, রাশেদ, সাইফুল ও নুর ইসলাম দাঁড়িয়ে কথা বলে। হাছান শাবল ও কোদাল নিয়ে সেখানে আসে। ইউসুফ দোকানের সামনে রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে দাগ দিয়ে গর্ত করতে বলে। শাবল তার হাতে দেয়। সে গর্ত করতে থাকে। গর্ত করার সময় পাশে কাশির শব্দ হওয়ায় কিছু সময় কাজ বন্ধ করে রাখে। তখন অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। মুফ্তি হান্নান উত্তর দিকে এবং রাশেদ দক্ষিণ দিকে পাহারা দিতেছিলো। কাজ বন্ধ দেখে মুফতি হান্নান উত্তর দিক থেকে এসে গালি দেয়। তখন ইউসুফ তার কাছ থেকে শাবল নিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে এবং কিছু সময় পর আবার তাকে শাবল দেয়। সে এমন ভাবে মাটি খুঁড়ে যাতে বোমাটি মাটির নীচে পোঁতা যায় এবং উপরে ৪ ইঞ্চি পরিমান জায়গা থাকে। গর্ত করাকালীন হান্নান টর্চ নিয়ে পাহারা দিতে থাকে। সে লোকজন দেখে টর্চ দিয়ে সিগ্নাল দিলে তারা দূরে সরে যায়। দুজন ভ্যানওয়ালা হাসপাতালের দিক থেকে আসে এবং গর্ত দেখে গর্তের কাছে দাঁড়ায়। তখন তারা পূর্ব পার্শ্বের দোকানের নীচে গিয়ে লোকায়। পরে সাইফুল, নুর ইসলাম, রাশেদ ভ্যানে একটি বোমা বস্তায় করে গাড়ী থেকে নিয়ে আসে। গর্তের কাছে উত্তর পার্শ্বে ভ্যান থামায়। সেখান থেকে ইউসুফ, নুর ইসলাম, সাইফুল বোমাটি ধরাধরি করে নামায়। এসময় ইউসুফ তাকে বলে উত্তরের দিকে ধাপধাপ সিঁড়ি আছে। সেখানে হাছান দাঁড়ানো আছে। সেখানে গিয়ে গর্ত করো। তখন সে যেয়ে দেখে হাছান কোদাল দিয়ে রাস্তার পার্শ্বে একটি গর্ত খুড়েছে। সে শাবল নিয়ে সেখানে যায়। গর্ত করে। গর্ত করা শেষ হলে সে পূর্বের গর্তের কাছে ইউসুফের কাছে গিয়ে গর্ত করা হয়েছে বলে জানালে ইউসুফ বোমাটি নিয়ে আসতে বলে। নূর ইসলাম, সাইফুল ও সে ভ্যান নিয়ে কিছু দক্ষিণে গিয়ে একটি পাকা বিল্ডিং এর সামনে তাদের কারখানার গাড়ীটি দাঁড়ানো দেখে। সে গাড়ীর

ডালা উঠায় এবং সাইফুল, নূর ইসলাম ও সে বোমাটি বস্তা সমেত নামিয়ে ভ্যানে উঠায়। পরে তারা তিন জনে ভ্যান ঠেলে নতুন গর্তের কাছে নিয়ে আসে। প্রথম গর্তের কাছে রাশেদ ও ইউসুফ ছিলো। মুফ্তি হান্নান টর্চ নিয়ে পাহারা দিচ্ছিলো। ইউসুফ উঠে তাদের কাছে আসে। নুর ইসলাম ও সাইফুল তাদের কাছে থাকা তার প্রথম বোমার সঙ্গে সংযোগ দিয়ে তার টাংগাতে থাকে। সে ও ইউসুফ বোমা নিয়ে ২য় গর্তের নিকট বসানোর কাজে যায়। বোমাটি সে, হাছান ও ইউসুফ ধরাধরি করে রাস্তার পার্শ্বে নিচু জায়গায় নামায়। তখন বোমাটি তিনজনে মিলে গর্তে রাখে। ইউসুফের কাছে থাকা তার ইউসুফ এবং হাসান বোমার সাথে সংযোগ দিয়ে তারের অপর প্রান্ত পাশের পুকুরের পূর্ব পাশে নিয়ে রাখে। রাত্রি অনুমান ৩:০০ টায় তারা সবাই একত্রে গাড়ীর কাছে যায়। ড্রাইভার রাশেদ ও হান্নান মুন্সী সামনে বসে। হাছান, নুর ইসলাম ও সে পিছনের সিটে বসে এবং গাড়ীতে করে গোপালগঞ্জ আসে। তাদের ব্যবহৃত শাবল, কোদাল, ছালার বস্তা গাড়ীতে করে নিয়ে আসে এবং কারখানায় রাখে। ইউসুফ মোটর সাইকেলে কারখানায় আসে। দুপুর ১২:০০/১:০০টায় সাইফুল কারখানায় ফেরৎ আসে।

আসামী খন্দকার কামাল উদ্দিন শাকের এবং সারোয়ার হোসেন মিয়ার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী গোপালগঞ্জ এর ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট প্রবীর কুমার চক্রবর্তী লিপিবদ্ধ করেছেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পি.ডব্লিউ-৫২ হিসেবে এ মামলায় সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। তিনি আসামী খন্দকার কামাল উদ্দিন শাকের-এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী এবং সারোয়ার হোসেন মিয়া-এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর সঠিকতা প্রমান করেন-যা যথাক্রমে প্রদর্শনী-৯ ও প্রদর্শনী ১০ হিসেবে চিহ্নিত হয়। তিনি তার স্বাক্ষর এবং আসামীদের স্বাক্ষর সনাক্ত করে প্রমান করেন। এ সাক্ষীর সাক্ষ্য মতে তিনি যথাযথ নিয়ম মেনে আসামীদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সাক্ষী আরো বলেছেন যে, তিনি সাক্ষী আহাদ হোসেন এর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত জবানবন্দী প্রদর্শনী-৮ হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শনী-৮ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আহাদ হোসেন নিজেকে ঘটনার সহিত সম্পৃক্ত করে কোন বক্তব্য দেয়নি। সে সাবান ফ্যাক্টরীর কর্মচারী হিসেবে তার দেনা মতে বোমার সরঞ্জাম আনা, বোমা তৈরীতে জড়িত ব্যক্তি ও বোমা কোটালীপাড়ার ঘটনাস্থলে নেয়ার ব্যাপারে ঘটনা প্রকাশ করেছে।

আসামী খন্দকার কামাল উদ্দিন শাকের-এর উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী (প্রদর্শনী-৯) তে সে বলেছে যে, সে লেখা-পড়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান যায়। সেখান থেকে আফগানিস্তান গিয়ে কমান্ডো ট্রেনিং গ্রহণ করে। ১৯৯৮ সাল থেকে মালিবাগ মাদ্রাসায়

পড়ার সময় সে হরকাতুল জেহাদ আল ইসলামীর মূখপাত্র জাগো মুজাহিদ অফিসে যাতায়াত করতো এবং সাথীদের সাথে পরিচয় হতে শুরু করে। তখন আমীর ছিল মুফ্তি আব্দুল হাই। মায়ানমার বর্মী মুজাহিদ সংগঠন RSO এবং RIF এর সাথে বাংলাদেশের হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামী এর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। তাদের থেকে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলাম বাংলাদেশ অস্ত্র ও অর্থের যোগান পেয়ে থাকতো। সে মায়ানমারে থাকাবস্থায় কমান্ডার ছিল হাফেজ ইয়াহিয়া (সিলেট)। দ্বিতীয় কমান্ডার ছিল মৌলভী শিব্বির আহমেদ (বগুড়া)। তৃতীয় কমান্ডার ছিল আবু বক্কর (সিলেট) এবং কমান্ডার ইন-চীফ ছিল মাওলানা আঃ রউফ (রাজৈর)। ডাঃ আঃ মতিন (যশোর), আমিরুল ইসলাম (গাজীপুর) ও মাওলানা আঃ কাইয়ুম (গাজীপুর) কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক। এরাও তখন ঐ ক্যাম্পে ছিল। আমিরুল ইসলাম ভালুকা সীডষ্টোর মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। তিনি ২০০০ ইং সালের মার্চ/এপ্রিলে রাজুর মাধ্যমে সংবাদ দিলে মুফ্তি আব্দুল হান্নানের গোপালগঞ্জস্থ সোনার বাংলা ক্যামিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিতে গিয়ে সাক্ষাৎ করে। মুফ্তি হান্নানের নির্দেশে ফরিদপুরে আইন শৃংখলার অবনতির জন্য ১৩/০৭/২০০০ ইং তারিখে পাক দরবার শরীফে তারা বিস্ফোরণ ঘটায়। আবু মুসা @ হারুন খুলনার অধিবাসী। তার সাথে তিন/চার বৎসর পূর্বে খিলগাঁও জাগো মুজাহিদ অফিসে তার দেখা হয়। আবু মুসা একজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ।

আসামী সারোয়ার হোসেন মিয়া তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে (প্রদর্শনী-১০) বর্ণনা করে যে, তার সম্বন্ধী মুফ্তি আব্দুল হান্নান আফগানিস্তানে মুজাহিদ ট্রেনিং গ্রহন করে এবং সেখানে যুদ্ধ করেছে বলে তাকে জানায়। এছাড়া সে প্রায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোর প্রভৃতি স্থানে গিয়ে বিভিন্ন মাদ্রাসার সাথে যোগাযোগ করে। সে হরকাতুল জেহাদ নামের একটি সংগঠনের সক্রিয় নেতা ছিল। গোপালগঞ্জে মুফ্তি হান্নানের সাবানের কারখানায় সে মাঝে মাঝে যেত। সেখানে কিছু হুজুর ও মুসল্লিকে দেখতে পায়। ঐ হুজুর এবং মুসল্লীরা হরকাতুল জেহাদের সদস্য। ঐ সোনার বাংলা সাবান ফ্যাক্টরীতে বোমা বানাতে সে দেখেছে। সাবান ফ্যাক্টরীর পিছনের ঘরে ঐসব হুজুর এবং মুসল্লীরা থাকত। ঐ ফ্যাক্টরীতে কোন সাবান দেখেনি, তবে কাঁটুন দেখেছে। উক্ত কারখানায় বিভিন্ন সময়ে মুফ্তি ধরনের লোক আসা-যাওয়া করতো। মুফ্তি হান্নানের ভাই আনিস তাকে বললে কারখানার জন্য কোটালীপাড়ায় হাসপাতালের সামনে জাকিরের একটি ঘর ভাড়া করে দেয় এবং জাকিরকে ঘর ভাড়া বাবদ আনিস দুই হাজার টাকা অগ্রিম প্রদান করে। ঘরের ভাড়া মাসে সাড়ে তিনশ টাকা ঠিক হয়। ঐ দোকানে সাবান ফ্যাক্টরীর সাইফুল নামে একটি ছেলে

থাকতো। মুফ্তি হান্নানের ছোট ভাই আনিস দেড় বৎসর যাবৎ তার বাড়ীতে ছিল। উক্ত সাইফুল মাঝে মধ্যে আনিসের সাথে তার বাড়ীতে আসতো। কারখানায় একটি সাদা প্রাইভেট কার ছিল। ঐ প্রাইভেট কারে করে যখন মালামাল আনতো তখন হুজুর ধরনের লোকজনকে ঐ প্রাইভেট কারে আসতে যেতে দেখেছে। মুফ্তি হান্নান মাঝে মাঝে তার বাড়ীতে আসতো। বোমা পাওয়ার প্রায় এক মাস আগে সাদা প্রাইভেট কারে করে ড্রাইভার রাশেদকে নিয়ে তার বাড়ীতে এসেছিল মুফ্তি হান্নান। বোমা পাবার ১০/১২ দিন আগে ইউসুফকে নিয়ে আরেকবার আসে। গত ১৯/০৭/২০০০ ইং তারিখে সন্ধ্যার পরে ঐ সাদা প্রাইভেট কার তার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। গাড়ীর উপরে একটি নীল পলিথিন দিয়ে ঢাকা ছিল। বোমা পাবার পর থেকে সাইফুলকে আর দেখেনি।

রমনা থানার মামলা নং-৪৬(০৪)২০০১ (জি.আর. নং-৮৭১/০১) ধারা-৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪ দ: বি: তে আসামী মুফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সী দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেছে। মো: শফিক আনোয়ার মহানগর হাকিম, ঢাকা এই আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে এ মামলার ঘটনার সম্পর্কে স্বীকারোক্তি রয়েছে। উক্ত জবানবন্দীর ফটোকপি প্রদর্শনী-১২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

প্রদর্শনী-১২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, মুফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সী উহাতে এ মামলার ঘটনা সম্পর্কে বলেছে যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসে। এরপর দেশের প্রখ্যাত আলেমগণ ইসলামী আইনানুযায়ী দেশে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বাইরে দেশের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের আলোকে ফতোয়া দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করে। তাতে আওয়ামী সরকার বাধা দিলে এবং ফতোয়ার বিচারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করলে হাইকোর্ট ফতোয়া দেয়া অবৈধ ঘোষণা করে। এতে আলেম ওলামাদের ভবিষ্যতে ফতোয়া দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। হাইকোর্টের রায় এখনও বলবৎ আছে। এছাড়া আওয়ামী সরকার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় একটি ফতোয়া জনিত ইসলামী জলসায় পুলিশ দিয়ে হামলা করে ইসলামী জলসা পন্ড করে দেয়। এর প্রতিবাদ করলে ৬(ছয়) জনকে গুলি করে হত্যা করে এবং বহু লোক আহত হয়। সেখানে বিখ্যাত আলেম মুফ্তি ফজলুল হক আমিনী সহ অনেককে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন কারণে মিরপুর-১১ নং মহিলা মাদ্রাসা হতে প্রিন্সিপাল মাওলানা শাফায়াত সহ ৪ জনকে গ্রেফতার পূর্বক জেল খানায় প্রেরণ করে। মোহাম্মদপুর রহমানিয়া মাদ্রসায় এন, পি. ও

এর একটি ঘটনায় নুর মসজিদের ভিতরে মুসল্লীদের উপর হামলা করলে সেখানে বাদশা নামক এক পুলিশ মারা যায় এবং অনেক মুসল্লী আহত হয়। এ ঘটনায় সাইখুল হাদিস সহ মাদ্রাসার শতাধিক ছাত্র গ্রেফতার হয়। এসব ঘটনায় দেশের আলেম ওলামারা মনে করেন যে, আওয়ামী লীগ ইসলাম বিদ্বেষী এবং এরা ভারতের দালাল হিসেবে ইসলাম ধবংস করার কাজে লিপ্ত। এ প্রেক্ষিতে ২০০০ ইং সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে মোহাম্মদপুর সুপার মার্কেটের পার্শ্বে পূর্বের অফিসে মাওলানা আবদুর রউফ, মাওলানা সাব্বির আহম্মদ, হাফেজ ইয়াহিয়া, মাওলানা আবু বকর, আবু মুসা ও আরো কয়েক জনের উপস্থিতিতে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের উপর হামলা করে তাদের প্রতিহত করে আলেম সমাজ তথা দেশ ও ইসলামকে বাঁচাতে হবে। উক্ত সিদ্ধান্ত মুগদা পাড়া অফিসে যেয়ে মুফ্তি শফিকুর ও আরো কয়েক জনের উপস্থিতিতে জানানো হয়। তখন মুফ্তি আঃ হাই জবাবে জানায় যে, তিনি হরকাতুল জিহাদের আরো কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবেন। পরবর্তীতে দলের আমেলা (প্রেসিডিয়াম সদস্য) মাওলানা আঃ রউফ, শেখ ফরিদ, হাফেজ ইয়াহিয়া, মাওলানা আবু বকর, মাওলানা সাব্বির আহম্মদ, মুফ্তি আঃ হাই এর উপস্থিতিতে মুফ্তি শফিকুর রহমান আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত দেয়। উক্ত নেতাগন তাদেরকে নিয়ে মুগদার ঐ অফিসে সে, আবু মুসা, মাওলানা আঃ রহমান, জাহাঙ্গীর বদর সহ কয়েকজন বসে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনা দরিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর সভায় গেলে তাঁকে হত্যা করার জন্য বোমা পোঁতার সিদ্ধান্ত নেয়। সে মোতাবেক ইয়াহিয়া বিস্ফোরক সংগ্রহ করে খুলনায় আবু মুসা ও সাব্বিরের নিকট দিবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। বোমা তৈরীর অন্যান্য সরঞ্জামাদী আবু মুসা ও সাব্বির স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। সব কিছু সংগ্রহ শেষ হলে আবু মুসা, মাওলানা সাব্বির বোমার সরঞ্জামসহ ঘটনার ৪/৫ দিন পূর্বে গোপালগঞ্জে তার সাবান কারখানায় আসে। ১৬ এবং ১৭ জুলাই ২০০০ ইং তারিখ রাতে সাবান কারখানার ভিতরে পর্দা ঘেরা রুমে বসে তার উপস্থিতিতে আবু মুসা, সাব্বির, নুর ইসলাম (তার সাবান কারখানার কর্মচারী, সে মুসলমান পাড়ার আওয়ামী লীগ নেতা চান মিয়ার বাড়ী-কোটালীপাড়া-এর বাসার নীচ তলায় ভাড়া থাকতো) দুটি বোমা ফিটিং করে। ১৯ তারিখ সন্ধার পর সাবান কারখানার কর্মচারী তারেক, হাসান, নুর ইসলাম, সাব্বির ও রাশেদ ড্রাইভার সাবান কারখানার গাড়ীতে করে বোমা দুটি নিয়ে কোটালীপাড়ায় যায় ও তার সাবান বিক্রির দোকানে জড়ো হয়। সে ও আবু মুসা মোটর সাইকেলে করে কোটালীপাড়ায় যায়। রাত ১২:০০ টার পর

তার নির্দেশে নুর ইসলাম, তারেক, মুসা, সাব্বির মিলে গর্ত করে একটি বোমা ষ্টেজের পূর্ব পার্শ্বে ওয়াল ও রাস্তার পর পুকুরের কিনারে রাখে। বোমাটির তার একটি টং চা-দোকানের নীচ দিয়ে পুকুরে রাখে। অপর একটি বোমা হেলিপ্যাডের কাছে রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে গর্ত করে পোঁতে রাখে। বোমার তার পুকুরের মধ্যে নিয়ে রাখে। সে ও রাশেদ রাস্তায় দাড়িয়ে পাহারা ও বোমা পোঁতার তদারকি করে। বোমা পোঁতার গর্ত করা কালে ২ জন ভ্যান চালক রাস্তার পাশ দিয়ে যাবার সময় গর্ত করা দেখছিল। বোমা পোঁতা শেষ হলে ফজরের আযান হয়। তারা সবাই গোপালগঞ্জে চলে আসার সময় পথে ফজরের নামাজ পড়ে। বোমা পোঁতার সংবাদ আমীর সাহেবকে দেয়ার জন্য সে ঢাকায় আসে এবং সে মুফ্তি শফিকুর রহমান ও আবদুল হাইকে কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনার সভার কাছে বোমা পোঁতার সংবাদ দিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় মালামাল কিনে আবার গোপালগঞ্জে চলে যায়। গোপালগঞ্জে পৌঁছে জানতে পারে তাদের পোঁতা বোমার মধ্যে মঞ্চের কাছের বোমাটি পুলিশ উদ্ধার করেছে। এ সংবাদ পেয়ে সে পরে ব্রিফ কেস নিয়ে কাপড়-চোপড়সহ পুনরায় ঢাকায় চলে আসে। আসার সময় সে কর্মচারীদেরকে কারখানায় থেকে কাজ করতে বলে।

এ মামলায় ৬৩ জন সাক্ষী ছাড়াও আসামী মো: আব্দুল হান্নান মুন্সী, মেহেদি হাসান ওরফে গাজী খান এবং মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে ওয়াসিম আক্তার নিজেদেরকে জড়িয়ে এবং অন্যান্য আসামীদেরকে জড়িত করে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে। অপর আসামী মো: আনিসুল ইসলাম ওরফে আনিস কিছুটা নিজেকে ঘটনার কাছাকাছি রেখে অন্যদের জড়িত করে জবানবন্দী প্রদান করেছে এবং আসামী মো: সারোয়ার মিয়া জাকিরের কাছ থেকে ঘর ভাড়া করে দিয়েছে মর্মে উল্লেখ পূর্বক ঘটনা সংঘটিত হবার পূর্বে আসামী মুফ্তি হান্নানসহ অন্যান্য আসামীদের গতিবিধি ও চলাফেরা দেখেছে মর্মে জবানবন্দীতে ব্যক্ত করেছে। উপরোক্ত জবানবন্দীগুলো প্রদর্শনী-১০ থেকে প্রদর্শনী-১৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ ৫টি জবানবন্দীর মধ্যে আসামী মুফ্তি হান্নানের জবানবন্দী একটি ব্যতিক্রম হিসেবে এ মামলায় অধিক গুরুত্ব বহন করে। কারণ আসামী মুফ্তি হান্নান বর্তমান মামলায় কোন দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেনি। সে রমনা থানার মামলা নং-৪৬(৪)২০০১ তে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে। লিপিবদ্ধকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য প্রদান করে উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর ফটোকপি প্রমান করেন-যা বর্তমান মামলায় প্রদর্শনী-১২ হিসেবে চিহ্নিত হয়। আসামী পক্ষ থেকে প্রশ্ন উঠেছে যে, অন্য

মামলায় প্রদত্ত ''দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী'' এবং উহার ''ফটোকপি'' প্রদর্শনী হিসেবে চিহ্নিত করে তা বর্তমান মামলায় সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না ? এক মামলার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী অন্য মামলায় ব্যবহারে কোন বাধা থাকে না যদি আইনের আবশ্যিক শর্ত পুরোপুরি পালন করা হয়। State of Maharastra vs Kamal Ahmed Mohammad Vakil Ansary, (2013) 12 SCC 17 এবং State of Gujarat vs. Mohd. Alik, AIR 1998 SC1686 মামলায় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত দেয় যে, ***confessional statement made by the accused in another case would be admissible if he is an accused in both the cases and that if the requirements of law are satisfied, it is immaterial whether the confession was made in one particular case or in a differant case.*** উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ আমাদের দেশের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ সমর্থন করে একই ধরনের অভিমত দিয়েছেন মুফ্তি আবদুল হান্নান বনাম রাষ্ট্র [69 DLR (AD) 490] মামলায়। তাছাড়া ১৮৭২ সনের সাক্ষ্য আইনের ৬৩(২) ধারা অনুযায়ী দোষ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দীর ফটোকপি Secondary evidence হিসেবে গ্রহণ করতে আইনগত কোন বাধা নেই। উক্ত ৬৩ ধারা হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:-

> *"63. Secondary Evidance-Secondary Evidance means and includes-*
>
> *(1) certified copies given under the provisions hereafter contained;*
>
> *(2) copies made from the original by mechanical processes which in themselves ensure the accuracy of the copy, and copies compared with such copies;*
>
> *(3) copies made from or compared with the original;*
>
> *(4) Counter-parts of documents as against the parties who did not execute them;*

(5) oral account of the contents of a document given by some person who has himself seen it."

প্রদর্শনী-১২ চিহ্নিত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী ফটোকপি হলেও তা Mechanical Process-এ অরিজিনাল থেকে উদ্ভূত এবং সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহনযোগ্য। এ বিষয়ে বহু নজিরও রয়েছে যার মধ্যে Gustad Monekji vs State, reported in PLD-1959 (Dacca) 756 উল্লেখযোগ্য- যেখানে বলা হয়েছে ঃ

''Photostat copy is admissible only when it is photostat of original document.''

পি.ডব্লিউ-৫৫ জনাব মো: শফিক আনোয়ার, ঢাকা মহানগর হাকিম হিসেবে মুফ্তি হান্নানের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন। অতিরিক্ত পাতাসহ মূল জবানবন্দীর মোট ২১ পাতা ফটোকপি এ মামলায় প্রদর্শনী-১২ হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং বিজ্ঞ হাকিম উক্ত ফটোকপির মূলকপিতে ২৫ টি স্বাক্ষর দিয়েছেন এবং আসামী মুফ্তি আব্দুল হান্নান ২৩ টি স্বাক্ষর প্রদান করেছে। অর্থাৎ রমনা থানার ৪৬নং মামলা তারিখ-২৪.০৪.২০০১ ইং -তে আসামী মুফ্তি হান্নানের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমান মামলাতে সাক্ষী (পি.ডব্লিউ-৫৫) দিয়ে উহা প্রমান করেন-যা প্রদর্শনী হিসেবে চিহ্নিত হয়। এ দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করার পর আসামীকে পুনরায় পড়ে শুনানো ও বুঝানো হলে আসামী সত্য বলে স্বীকার করে তাতে স্বাক্ষর প্রদান করে। এই আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করার পূর্বে তাকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় কারণ দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর মাধ্যমে তার এবং তার সহযোগীদের কারাদন্ড হতে পারে। এই সাক্ষী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছেন যে, আসামী মুফ্তি আবদুল হান্নান মুন্সী স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে নিজেকে এবং অন্যান্য আসামীদেরকে জড়িয়ে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেছে। তিনি এ ব্যাপারে সার্টিফিকেটও দিয়েছেন। এ ধরনের confession-এর ফটোকপি Secondary Evidance হিসেবে গণ্য করতে আইনগত কোন বাধা নেই। কারণ উক্ত ফটোকপি মূল কপি হতে photostat করা হয়েছে এবং দোষ স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ব্যক্তি অর্থাৎ মুফ্তি আব্দুল হান্নান উভয় মামলার গুরুত্বপূর্ন আসামী । আমাদের আপীল বিভাগ উক্ত মূল জবানবন্দীর ফটোকপি মুফ্তি আব্দুল হান্নান বনাম স্টেট মামলায়

[৬৯ ডি.এল.আর, আপীল বিভাগ, পৃষ্ঠা-৪৯০] ব্যবহার করতে গিয়ে নিম্নরুপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন:

"This confession has been marked as exhibit-9(Kha) and it has been proved by PW 49. He stated that he recorded the statement in accordance with law. He proved the signature of the accused and his signature. He made direct evidence that accused made a confession and he has been cross-examined by the defence. However, he proved the copy of the statement by secondary evidence. A photostat copy of the original which was obtained by mechanical process ensures its accuracy. It would have been better if the prosecution could produce the certified copy of the confession. This confession is relevant in which he admitted his complicity by supplying grenades to Bipul and Ripon, which he knew that the blasting of grenade is so dangerous that it would cause death to persons upon whom it would be used and exploded. PW 49 proved that he recorded the statement by observance of all formalities prescribed by law. From the above conspectus, a confession made by an accused person in connection with another case is found to be releva nt in connection with other case and if the

offences committed in course of the same transaction and if the confession has been duly recorded in accordance with law. Secondary evidence after fulfillment of the requirements of section 66 may be adduced to prove the confession and if the person making the confession is accused in both or all the incidents of commission of offences."

পি.ডব্লিউ-৫৫, ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ এবং ৩৬৪ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী পালন পূর্বক মুফ্তি হান্নানের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন-যা তিনি বর্তমান মামলায় উপস্থাপন করে প্রমান করতে পেরেছেন এবং আসামী পক্ষও উক্ত জবানবন্দী এবং উহার ফটোকপি সম্পর্কে এই সাক্ষীকে পূঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা করে তার উক্তরুপ বক্তব্য থেকে বিচ্যুতি ঘটাতে পারেননি। উপরোক্ত আইন ও নজির থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে উক্ত প্রদর্শনী-১২ অত্র মামলার ঘটনার সাথে প্রাসঙ্গিক এবং উহা এ মামলায় ব্যবহার করা যাবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সহযোগী আসামীদের ক্ষেত্রে উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রযোজ্য হবে কি না। এ বিষয়ে বুঝার সুবিধার্থে সাক্ষ্য আইনের ৩০ ধারা দেখা যেতে পারে -যা নিম্নরুপ:

"When more persons than one are being tried jointly for the same offence, and a confeession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, the Court may take into consideration such confession as against such other of such persons as well as against the person who makes such confession. Explanation-'Offence',

as used in this section, includes the abetment of, or attempt to commit, the offence."

সাক্ষ্য আইনের ১০ ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একই অপরাধের জন্য একাধিক ব্যক্তির যৌথ বিচারের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এক জনের দোষ স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দীর মাধ্যমে নিজেকেসহ অন্যদেরকে জড়িয়ে দোষ স্বীকার করলে এবং তা প্রমানিত হলে উহা আদালত সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে বিবেচনায় নিতে পারবে। সুতরাং আসামী মুফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী সাক্ষ্য হিসেবে সহযোগী আসামীদের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য। তবে উক্ত জবানবন্দী সহযোগী আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমর্থন মূলক সাক্ষ্য প্রয়োজন মর্মে উচ্চ আদালত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বোমা তৈরীর উপকরণ ও সরঞ্জামাদী এবং জব্দকৃত আলামত এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য মুফ্তি হান্নান মুন্সীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীকে সমর্থনমূলক সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

পি.ডব্লিউ-৫২ জনাব প্রবীর কুমার চক্রবর্তী একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আসামী মো: সারোয়ার মিয়া এর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী, পি.ডব্লিউ-৫৪ জনাব রফিকুল ইসলাম একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আসামী মুন্সী আনিসুল ইসলামের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী এবং পি.ডব্লিউ-৫৬ জনাব এ.কে.এম. আঃ সালাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আসামী মেহেদি হাসান ওরফে গাজী খান ও আসামী মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে ওয়াসিম আক্তারের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন এবং সাক্ষ্য দিয়ে তা প্রমান করেন। যা প্রদর্শনী-১০-১৪ হিসেবে চিহ্নিত হয় (মুফ্তি হান্নানের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীসহ) ।

উপরোক্ত প্রদর্শনীগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত আসামীরা জবানবন্দী প্রদান কালে কোন অভিযোগ উত্থাপন করেনি যে, তারা মারধর, ভয়-ভীতি অথবা পুলিশের নির্যাতনের কারণে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেছে। উল্লেখিত পি.ডব্লিউ-৫২, ৫৪, ৫৫ এবং ৫৬ গনও তাদের সাক্ষ্যে বলেছেন যে, দোষ স্বীকারোক্তির পরিনতি সম্পর্কে আসামীদেরকে জ্ঞাত করেছেন এবং আসামীরা স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকারোক্তি করেছে মর্মে প্রত্যয়ন পত্রও দিয়েছেন।

উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীগুলি আরো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আসামীরা গ্রেফতার হওয়ার এবং ঘটনার পরপরই জবানবন্দী প্রদান করেছে। যদিও আসামী মুফ্‌তি হান্নান এর জবানবন্দী ঘটনার অনেক পরে রেকর্ড করা হয়েছে কারণ সে দীর্ঘদিন পলাতক ছিল। তবে উপরোক্ত আসামীগনের জবানবন্দীর বর্ণনার সাথে আসামী মুফ্‌তি হান্নানের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর পুরোপুরি মিল পাওয়া যায় এবং অপরাধের ধারাবাহিকতাও পরিলক্ষিত হয়।

পি.ডব্লিউ ১ ও ২ সহ বোমা উদ্ধারের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সাথে উপরোক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর বক্তব্যের মধ্যে মিল এবং ধারাবাহিকতা রয়েছে এবং একে অপরকে সমর্থন করেছে। যেহেতু দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীগুলো আসামীদের নির্যাতন বা জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ করে আদায় করা হয়নি মর্মে প্রমান হয়েছে এবং ওগুলো স্বত:স্ফুর্ত, দোষযুক্ত, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত এবং অন্যান্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত এবং ঘটনার ধারাবাহিকতায় মিল রয়েছে সেহেতু উক্ত জবানবন্দীগুলিকে কোনভাবেই আইন বহির্ভূত বলা যাবে না। এ ব্যাপারে পূর্বে উল্লেখিত মুফ্‌তি আ: হান্নান বনাম রাষ্ট্র [69 DLR (AD), 490] মামলায় উচ্চ আদালতের প্রদত্ত অভিমত প্রাসঙ্গিক-যা নিম্নে উদ্ধৃত হল:

> *"These confessions are natural, voluntary, inculpatory and corroborative to each other. Thus one cannot harbour any doubt that those have been procured from them by means of coercion, duress or torture. One confession was recorded at Dhaka and the other two at Sylhet by different officers. There are corroborative statements as regards supply of four grenades by accused Mufti Abdul Hannan to Bipul and Ripon of Sylhet from his Badda office and that out of the same Bipul and Ripon used one grenade killing three persons and injuring innumerable*

persons at the gate of Hazrat Shahjalal (R). These confessions are inculpatory in nature and conviction can be based upon them. There is no doubt about it, that Mufti Hannan became an activist of the terrorist organization is admitted from his confresson and in due course he became a leader and philosopher of the organization is also revealed from the statement. He monitored all terrorist activities which are evident from the statement of Bipul that after the detonation he had informed Mufti Hannan that the blasting was successfully conducted."

মুফতি হান্নানের দোষ স্বীকারোক্তি সম্পর্কে আপীল বিভাগ মত প্রকাশ করেছেন যে, উহা এতই দোষযুক্ত স্বাভাবিক জবানবন্দী যার উপর ভিত্তি করে সাজা প্রদান করতে কোন সন্দেহ থাকে না।

আসামী মো: সারোয়ার মিয়া, মো: আনিসুল ইসলাম আনিস, মুফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সী, মেহেদি হাসান ওরফে গাজী খান এবং মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে ওয়াসিম আক্তারের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীসমূহ তুলনামূলকভাবে একত্রে বিশ্লেষণ করলে উহাদের মধ্যে পারস্পারিক সামঞ্জস্যতা আছে বলে প্রতীয়মান হয়। আসামী মুফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সী তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন যে, ২০০০ সালের জুলাই মাসের প্রথমে ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ সুপার মার্কেটের অফিসে মাওলানা রউফ, মাওলানা সাব্বির আহমেদ, হাফেজ ইয়াহিয়া, মাওলানা আবু বকর, আবু মুসাসহ আরও কয়েকজনের উপস্থিতিতে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । এ আলোচনার সিদ্ধান্ত তাদের আমীর মুফ্তি শফিকুর রহমানকে জানানো হলে সে পরবর্তীতে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের দল হরকাতুল জিহাদ এর প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা আঃ রউফ, শেখ ফরিদ, হাফেজ ইয়াহিয়া, মাওলানা আবু বকর, মাওলানা সাব্বির আহমেদ এবং মুফ্তি আব্দুল হাই এর উপস্থিতিতে

রাজধানীর ঢাকাস্থ মুগদাপাড়ার অফিসে মুফ্তি আব্দুল হান্নান মুন্সীসহ তাদের আমীর মুফ্তি শফিকুর রহমান আওয়ামী লীগকে প্রতিহত করার সিদ্ধান্ত দেয় এবং গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনা দরিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর সভায় গেলে তাকে হত্যা করার জন্য শক্তিশালী বোমা পোঁতার সিদ্ধান্ত হয় এবং সে মোতাবেক ইয়াহিয়া বিস্ফোরক সংগ্রহ করে খুলনার আবু মুসা ও সাব্বিরের নিকট দিবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। বোমা তৈরীর অন্যান্য সরঞ্জাম আবু মুসা ও সাব্বির আহমেদ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। সব কিছু সংগ্রহ শেষ হলে আবু মুসা মাওলানা সাব্বির বোমার সরঞ্জামসহ ঘটনার ৪-৫ দিন পূর্বে মুফ্তি আব্দুল হান্নানের গোপালগঞ্জস্থ সাবান কারখানায় আসে। সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা মাফিক ১৬ এবং ১৭ই জুলাই ২০০০ ইং তারিখ রাতে তার সাবান কারখানার ভিতরে পর্দা ঘেরা রুমে বসে তার উপস্থিতিতে আবু মুসা, সাব্বির এবং নুর ইসলাম মিলে ২টি বোমা ফিটিং করে। ১৯ তারিখ সন্ধ্যার পর সাবান কারখানার কর্মচারী তারেক, হাসান, নুর ইসলাম, সাব্বির ও রাশেদ ড্রাইভার সাবান কারখানার গাড়ীতে করে বোমা ২টি নিয়ে সাবান বিক্রির জন্য ভাড়া করা দোকানে জড়ো হয়। মুফ্তি হান্নান ও আবু মুসা মোটর সাইকেলে করে কোটালীপাড়ায় যায়। রাত আনুমানিক ১২:০০ ঘটিকার পর মুফ্তি হান্নানের নির্দেশে নুর ইসলাম, তারেক, মুসা, সাব্বির মিলে গর্ত করে একটি বোমা স্টেজের পূর্ব পাশে ওয়াল ও রাস্তার পর পুকুরের কিনারে রাখে। বোমাটির তার একটি টং চা-দোকানের নিচ দিয়ে পুকুরে রাখে। অপর একটি বোমা হেলিপ্যাডের কাছে রাস্তার পূর্ব পাশে পোঁতে রাখে। বোমার তার পুকুরের মধ্যে নিয়ে রাখে। সে সময় আসামী মুফ্তি আব্দুল হান্নান ও রাশেদ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বোমা পোঁতার তদারকি করে। বোমা পোঁতা শেষে ফজরের নামাজের সময় তারা গোপালগঞ্জ চলে আসে। বোমা পোঁতার বিষয়ে আসামী মুফ্তি হান্নান তাদের নেতা আমীর মুফ্তি শফিকুর রহমান ও আব্দুল হাইকে ঢাকায় এসে সংবাদ দিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় মালামাল নিয়ে আবার গোপালগঞ্জে ফিরে যায়। বোমা উদ্ঘাটনের সংবাদ পেয়ে মুফ্তি হান্নান পুনরায় ঢাকায় ফিরে যায়।

তার এ জবানবন্দী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মূলত: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান টার্গেট করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয় ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ বাস স্ট্যান্ডের পাশে সুপার মার্কেটের অফিসে এবং মুগদাপাড়া অফিসে। ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা বিহীন এ ধরনের ঘটনা সংঘটন করাও দুরুহ ব্যাপার। সুতরাং এ মামলার ঘটনা সংঘটনের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন বিষয় এবং যারা এ ষড়যন্ত্রের সাথে সরাসরিভাবে জড়িত তাদেরকে খাটো বা

ছোট করে দেখার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। আসামী মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে ওয়াসিম আক্তারের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, পর্দা ঘেরা রুমে বসে আসামী আব্দুল হান্নান মুন্সী, হাসান, নুর ইসলাম, ইউসুফ এ বিষয়ে আলোচনা করে। বোমা পোঁতার কিছু দিন পূর্বে সাবান কারখানার প্রাইভেট গাড়ীতে করে অনুমান ১ ফুট উচু ২টি ড্রাম আনে ড্রাইভার রাশেদের মাধ্যমে। ড্রামের ওজন প্রায় ২০ কেজি এবং ড্রামের সাথে ২টি ঢাকনাও ছিল। পর্দা ঘেরা রুমে বসে ইউসুফ তাতাল দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সাথে পেন্সিল ব্যাটারীর কানেকশন দেয়। যেদিন বোমা নিয়ে কোটালীপাড়া যায় তার ১ দিন পূর্বে নুর ইসলাম তাকে ড্রিল মেশিন পর্দার বাহির থেকে ভিতরে নিয়ে ৩টি ছিদ্র করতে বললে সে ও ইউসুফ একটি ড্রামে ৩টি ছিদ্র করে। অপর ড্রামটিতে সে ও গাজী ৩টি ছিদ্র করে। তারপর নুর ইসলাম, ইউসুফ, আব্দুল হান্নান মুন্সী এবং হাসান ড্রাম দুটিতে ২টি বোমা তৈরী করে। গাজী ২টি কাঠ সাইজ করে কেটে রাখে এবং বোমা ২টি ছালার বস্তায় ভরে রাখে। গত ১৯/০৭/২০০০ ইং তারিখ মাগরিবের কিছু আগে হাসান তাকে ১টি বোমা ধরতে বললে সে ও হাসান ঐটিকে নিয়ে সাবানের স্টোরে রাখে। সেখান থেকে বোমাটি হাসান, নুর ইসলাম এবং সে কারখানার গাড়ীর পেছনের ডালার মধ্যে রাখে। মুরাদ এ ঘটনা দেখে ফেললে তাকে অন্য দিকে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অন্য বোমাটিও রাশেদ, হাসান এবং সে গাড়ীটির পেছনের ডালায় রাখে। সে, হাসান, নুর ইসলাম, সাইফুল এবং গাড়ী চালক রাশেদ কোটালীপাড়ায় ২২শে জুলাই প্রধানমন্ত্রীর মিটিং এর সময় তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা সেখানে নিয়ে যায়। ব্যক্তিগত গাড়ীতে অনেক লোক এক সাথে দেখলে সন্দেহ করবে সেজন্য সে এবং হাসান ঘাগড় ব্রিজের পূর্বে নেমে যায়। তারপর হাটতে হাটতে কারখানার নামে ভাড়া করা দোকানে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে তারা সাইফুল, রাশেদ ও নুর ইসলামকে পায়। রাত ১২:০০ ঘটিকার সময় তারা দুজন পায়ে হেটে কলেজের দিকে যাওয়ার সময় মুফ্তি হান্নানের সাথে দেখা হয়। তারা শাবল, কোদাল ও কয়লার গুড়া গাড়ীতে করে নিয়ে গিয়েছিল। ইউসুফ দোকানের সামনে রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে দাগ দিয়ে কোদাল দিয়ে গর্ত করতে বললে সে গর্ত খুঁড়তে থাকে। গর্ত করার সময় পাশে কাশির শব্দ এবং ঘরের দরজার শব্দ হওয়ায় কিছু সময় কাজ বন্ধ রাখে। তখন অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। এ সময় মুফ্তি হান্নান উত্তরে এবং রাশেদ দক্ষিণ দিকে পাহারা দিচ্ছিল। ইউসুফও তার কাছ থেকে শাবল নিয়ে কিছুক্ষন মাটি খুঁড়ে আবার তার হাতে শাবল দিয়ে দেয়। সে এমনভাবে মাটি খুঁড়ে যাতে বোমাটি মাটির নীচে পোঁতা সম্ভব হয় এবং উপরে ৪ ইঞ্চি পরিমান জায়গা খালি থাকে।

মুফ্তি হান্নান লোকজন দেখে টর্চ দিয়ে সিগনাল দিলে তারা দূরে সরে যায়। অর্থাৎ দোকানের নীচে গিয়ে লুকায়। সাইফুল, নুর ইসলাম, রাশেদ ভ্যানে করে ২টি বোমা এনে ধরাধরি করে গর্তে নামায়। এসময় ইউসূফ তাকে বলে উত্তর দিকে ধাপ ধাপ সিঁড়ি আছে সেখানে হাসান দাড়ানো এবং সেখানে গিয়ে একটি গর্ত খুঁড়ার জন্য। সে শাবল দিয়ে গর্ত করে এবং শেষে ইউসুফ বোমাটি নিয়ে আসতে বললে সে, নুর ইসলাম ও সাইফুল কারখানার গাড়ীটি থেকে বোমা নিয়ে ভ্যানে করে গর্তের কাছে নিয়ে যায়। প্রথমে গর্তের কাছে রাশেদ ও ইউসুফ ছিল। টর্চ নিয়ে মুফতি হান্নান পাহারা দিচ্ছিলো। নুর ইসলাম ও সাইফুল তাদের কাছে থাকা বৈদ্যুতিক তার দিয়ে দ্বিতীয় বোমার সংগে সংযোগ দিয়ে তার টানাতে থাকে। সে ও ইউসুফ দ্বিতীয় বোমা নিয়ে বোমা বসানোর কাজে যায়। বোমাটি সে, ইউসুফ ও হাসান তিন জনে মিলে গর্তে রাখে। ইউসুফ এবং হাসান বোমার সাথে সংযোগ দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের অপর প্রান্ত পাশের পুকুরের পূর্ব পাশে নিয়ে রাখে। তখন রাত্র প্রায় ৩:০০ টা বাজে। এরপর তারা সবাই কারখানার গাড়ীতে করে শাবল, কোদাল, ছালার বস্তা নিয়ে কারখানায় ফিরে আসে। ইউসুফ মোটর সাইকেল নিয়ে আসে। দুপুর ১২/১ টার দিকে সাইফুল কারখানায় ফেরত আসে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পি.ডব্লিউ-৬৩ এর সাক্ষ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উক্ত শাবলসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি জব্দ করা হয়েছে -যা প্রদর্শনী-২২ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উপরোক্ত আসামীর জবানবন্দীর সাথে জব্দ তালিকায় বর্ণিত উদ্ধারকৃত মালামালের যোগসূত্র পাওয়া যায়।

ইতোমধ্যে প্রদর্শনী-১৩ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে- যাতে আসামী মেহেদি হাসান ওরফে গাজী খান উল্লেখ করে যে, আসামী ইউসুফ, নুর ইসলাম ওরফে ইসমাইল, হাসান, মুফ্তি আবদুল হান্নান মুন্সী পর্দা ঘেরা রুমে বসে ২টি বোমা তৈরী করে এবং ড্রামে ঢাকনা লাগিয়ে দেয়। সে এবং তারেক একটি ড্রামে ৩টি ছিদ্র করে, অপর ড্রামে তারেক ও ইউসুফ ড্রিল মেশিন দিয়ে ছিদ্র করে। বোমা উদ্ধারের ঘটনার আগের দিন আসরের নামাজের পর সাইফুল আসে এবং ড্রাইভার রাশেদ সাদা প্রাইভেট কারটি সাবান কারখানার চুলা ঘরের মাঝ বরাবর রাখে। তাকে পাহারা দিতে বললে সে পাহারা দেয়। তারেক, রাশেদ, হাসান বোমা ২টি গাড়ীর পেছনের ডালায় তোলে এবং তারা তিনজনসহ নুর ইসলাম, সাইফুল উক্ত গাড়ীতে করে বের হয়ে যায়। মুফ্তি হান্নান এবং ইউসুফ মোটরসাইকেল নিয়ে যায়। পরের দিন সকালে রাশেদ গাড়ী নিয়ে মুফ্তি হান্নান, হাসান, নুর ইসলাম এবং তারেক সাথে আসে। ইউসুফ মোটর সাইকেলে আসে। সাইফুল বেলা অনুমান ১২:০০ ঘটিকার

সময় কোটালীপাড়া থেকে আসে। উপরোক্ত আসামীদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী বিশ্লেষন করলে তাদের বক্তব্যে সামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। এ মামলার মূল ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করে আসামী মুফ্তি আব্দুল হান্নান। সে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে অন্যতম-যা তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী সত্য এবং স্বেচ্ছা-প্রনোদিত বলে আমরা ইতিপূর্বেও আলোচনা করেছি।

আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন যে, যেহেতু আসামী মুফ্তি হান্নানকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়নি কাজেই তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর কোন মূল্য নেই। উভয় পক্ষের স্বীকৃত মতে আসামী মুফ্তি হান্নানকে বর্তমান মামলায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারা অনুযায়ী পরীক্ষা করার পূর্বেই সিলেটে ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে আক্রমন করার মামলায় তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। যদি দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদানের পর কোন আসামী জামিনে মুক্তি পেয়ে পলাতক হয়ে যায় তাহলে তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী মূল্যহীন হয়ে পড়বে একথা বলার কোন সুযোগ থাকে না। সাক্ষ্য গ্রহণের পর মুফ্তি হান্নানের উপস্থিতিতে ৩৪২ ধারা অনুযায়ী সকল সাক্ষ্য এবং দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী উপস্থাপন করলে সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা অধিকতর শক্তিশালী হতো এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, প্রতি উত্তরে তার কিছু বক্তব্য থাকলেও থাকতে পারতো। কিন্তু যখন দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর অনেক পরে তা প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করে তখন প্রতীয়মান হয় যে, সে স্বেচ্ছায় জবানবন্দী দিয়েছে -যা ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষার সময় একই ধরনের ফলাফল বয়ে আনতো। আমরা ইতোমধ্যে তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনা করে দেখেছি যে, সে স্বেচ্ছায় এবং নিজেকেসহ অন্য আসামীদেরকে জড়িয়ে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করেছে। লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য দিয়ে উক্ত বিষয় সমর্থন করেছেন এবং তা প্রমান করেছেন। সুতরাং দোষ স্বীকারোক্তির পরবর্তী বক্তব্য অথবা প্রত্যাহারের আবেদন দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীকে কোন ভাবে খাটো করে না। ৪৫ ডিএলআর এর ২৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বকুল চন্দ্র সরকার বনাম রাষ্ট্র মামলায় বলা হয়েছে যে,''***Retraction is immaterial once it is found to be voluntary and true.***''

আদালতের নিকট যে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী সন্দেহের D‡ র্ধ্ব থাকে অর্থাৎ সত্য ও স্বেচ্ছা-প্রনোদিত বলে প্রতীয়মান হয় সে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর উপর নির্ভর করতে কোন ঝুকি থাকে না। কারণ উক্তরুপ জবানবন্দী লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যক্ষভাবে আসামীকে পরীক্ষা করেন তার নিজস্ব খাস কামড়ায়। সেখানে অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ খুব কমই থাকে। তাছাড়া কোন দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী খুব সতর্কতার সাথে পাঠ করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, উহাতে কোন গলদ আছে কিনা। এ মামলায় দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদানের দীর্ঘদিন পর আসামী কর্তৃক উহা প্রত্যাহারের আবেদন সন্দেহজনক পদক্ষেপ বলে মনে হয়। আবার তাৎক্ষনিকভাবে প্রত্যাহারের আবেদন না করে দেরীতে উহা করা হলে তা পরবর্তী চিন্তাপ্রসূত (after thought) বলেও প্রতীয়মান হয়। এমনকি এ ধরনের বিলম্বিত ‘‘প্রত্যাহারের আবেদন’’ দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীকে শক্তিশালী করে। তাছাড়া মুফ্তি হান্নানের একই দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী আপীল বিভাগ পূর্বে উল্লেখিত মুফ্তি হান্নান বনাম রাষ্ট্র মামলায় সত্য ও স্বেচ্ছা প্রনোদিত মর্মে বিবেচনা পূর্বক উহা উক্ত মামলায় সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিকে এড়িয়ে যাওয়া বা উহাকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের নেই। ইহা ছাড়াও, ***“Retracted confession is also admissible against each other when confession of each may corroborate that of the other [Ram Prokash PLD 1959 SC (IND) 1919]. A confession which is voluntary even if retracted later, could be the sole basis for a conviction [Ref. PLD 1964 (SC) 413, 31 DLR 312, 16 DLR (Dhaka) 598 and 32 DLR 227].”***

আসামী মুফ্তি হান্নানের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী সত্য ও স্বেচ্ছা প্রনোদিত এ কারণে যে, সে প্রত্যক্ষভাবে বোমা পোঁতার কাজে অংশগ্রহণ করেছিল অন্যান্য আসামীগনের সাথে-যা স্থানীয় সাক্ষীরা তাদের সাক্ষ্য দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন এবং দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদানকারী অন্যান্য আসামীরাও যে বর্ণনা দিয়েছে তার সাথে মুফ্তি হান্নানের দোষ স্বীকারোক্তির পরিষ্কার মিল ও অপরাধ কর্মের ধারাবাহিকতা রয়েছে। ***"When the confession is proved against***

confessing accused that can be taken into consideration against co-accused in the same offence [Nousher Ali Vs. State, 39 DLR (AD) 194]."

এ মামলার সংঘটিত ঘটনার অন্যতম আসামী ওয়াসিম আক্তার ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে মারফত আলী তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে নিজেকে ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত মর্মে উল্লেখ করেন এবং অন্যান্য আসামীরাও তাদের জবানবন্দীতে এ আসামীর জড়িত থাকার ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন। সাক্ষীদের মধ্যে পি.ডব্লিউ-১০ শেখ হাবিবুর রহমান তার জবানবন্দীতে বলেন যে, আসামী তারেক তাদের সামনে তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে স্বীকার করে যে, সে এবং মুফ্তি আবদুল হান্নান মুন্সীসহ অন্যান্য আসামীরা গোপালগঞ্জ শহরস্থ মুফ্তি আবদুল হান্নান মুন্সীর সোনার বাংলা কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি এর মধ্যে ২টি বোমা তৈরী করে গত ১৯/০৭/২০০০ ইং তারিখে বিকাল বেলায় গাড়ী যোগে কোটালীপাড়া নিয়ে যায় এবং সেখানে নিয়ে গিয়ে বোমা ২টি উল্লেখিত পৃথক ২টি স্থানে পোঁতে রাখে। আসামী তারেক তার স্বীকারোক্তিতে কিভাবে ঐ বোমা তৈরী করে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় এবং সেখানে পোঁতে রাখে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়। তারেক আরো জানায় যে, তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সফরসঙ্গীদের হত্যার উদ্দেশ্যে ঐ বোমা ২টি পোঁতে রেখেছিল। পি.ডব্লিউ-২০ কাজী শহিদুল ইসলাম উক্ত সাক্ষীকে সমর্থন করে তার সাক্ষ্যে বলেন যে, আসামী তারেক তাদের সামনে ঘটনার কথা স্বীকার করে এবং বলে যে, সাবান কারখানার পর্দা ঘেরা রুমে বসে সে এবং মুফ্তি হান্নানসহ অন্যান্য সহযোগী আসামীরা মিলে উদ্ধারকৃত বোমা ২টি তৈরী করে। সাবান কারখানার উক্ত কক্ষে বসে বোমা তৈরীর পর গত ১৯/০৭/২০০০ ইং তারিখে সন্ধ্যার আগে প্রাইভেট কার যোগে ঐ বোমা ২টি কোটালীপাড়ায় নিয়ে যায় এবং দিবাগত রাত্রে তারা ঘটনাস্থলে ঐ বোমা দু'টি পোঁতে রাখে।

পি.ডব্লিউ-২১ মো: কামাল হোসেন শেখ তার সাক্ষ্যে বলেন যে, আসামী তারেক তাদের সম্মূখে স্বীকার করে যে, সে গত ১৯/০৭/২০০০ ইং তারিখ দিবাগত রাত্রে তার সহযোগীদেরকে নিয়ে কিভাবে অংশগ্রহণ করে বোমা পোঁতেছিল তা দেখায়। এই বিষয়টি ভিডিওতেও ধারন করা হয়। আসামী তারেক তাদের সামনে আরো স্বীকার করে যে, গত ২২/০৭/২০০০ ইং তারিখে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর কোটালীপাড়ার জনসভায় ঐ বোমা ২টি বিস্ফোরন ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে এবং সরকারী গাড়ী-যানবাহন, হেলিকপ্টার, হেলিপ্যাডসহ সরকারী ও বেসরকারী জানমাল ধ্বংস করার

জন্য সে ও তার সহযোগী মুফ্তি আবদুল হান্নান, রাশেদ, আনিস, গাজী ও ইউসুফসহ আরো কয়েকজন মিলে বোমা ২টি তৈরী করেছিল এবং ঘটনাস্থলে পোঁতে রেখেছিল। উপস্থিত সাক্ষীদের মধ্যে পি.ডব্লিউ-২২ মুজিবুল হক তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন যে, আসামী তারেক তাদের সামনে স্বীকার করে যে, সে এবং তার সহযোগী মুফ্তি হান্নান, সাইফুল, রাশেদ, ইউসুফ, হাসান আরও কয়েকজন মিলে ঐ ২টি বোমা তৈরী করে গত ১৯/০৭/২০০০ ইং তারিখে বিকাল বেলায় কোটালীপাড়ায় নিয়ে যায় এবং ঘটনাস্থলে পোঁতে রাখে। এই সাক্ষী উপরোক্ত সাক্ষীদের বক্তব্যকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করেন। পি.ডব্লিউ-২৪ মো: আশ্রাফুল ইসলাম উপরোক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে সমর্থন করে বলেন যে, আসামী তারেক তাদের সামনে স্বীকার করে যে, মুফ্তি হান্নান ও অন্যান্য সহযোগী আসামীগন মিলে সাবান কারখানার পর্দা ঘেরা রুমে বসে ২টি বোমা তৈরী করে এবং গত ১৯/০৭/২০০০ ইং তারিখে কারখানার গাড়ীতে বহন করে নিয়ে কোটালীপাড়া কলেজ মাঠে প্রধানমন্ত্রীর ২২/০৭/২০০০ ইং তারিখের জনসভা স্থলের পাশে একটি বোমা এবং হেলিপ্যাডের পার্শ্বে অপর বোমাটি পোঁতে রাখে।

পি.ডব্লিউ-২৯ দেলোয়ার হোসেন সরদার, পি.ডব্লিউ-৩০ আফজাল চৌধুরী, পি.ডব্লিউ-৩২ আয়নাল হোসেন এবং পি.ডব্লিউ-৪২ মো: মুরাদ হোসেন একই সুরে বক্তব্য দিয়ে উপরোক্ত সাক্ষীদের দেয়া সাক্ষ্যকে সমর্থন করে বলেন যে, আসামী তারেক তাদের সামনে স্বীকার করে, কিভাবে তার সহযোগীদের নিয়ে বোমা ২টি তৈরী করে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় এবং প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সফরসঙ্গীদের হত্যা করার জন্য ঘটনাস্থলে পোঁতে রাখে। আসামী তারেকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বোমা তৈরীর অন্যান্য সরঞ্জামাদিও উদ্ধার করা হয়। পি.ডব্লিউ-৪২ তাকে ডকে শনাক্ত করেন।। এখানে ৪৫ ডি.এল.আর এর ৬৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বশির আলী বনাম রাষ্ট্র মামলার নজির উল্লেখ করা যেতে পারে-যা নিম্নরুপ:

"An information even by way of confession made in police custody which relates to the fact discovered is admissible in evidence against the accused."

আসামী তারেক বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে বিস্তারিত উল্লেখ করেছে কিভাবে বোমা তৈরী করে তার সহযোগীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে ঐগুলো পোঁতা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সফরসঙ্গীদেরকে হত্যা করার জন্য। তার জবানবন্দী প্রদর্শনী-১৪ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দোষ স্বীকারোক্তিমূলক

জবানবন্দী প্রদান কালে এই আসামী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পুলিশী নির্যাতনের কোন অভিযোগ উল্লেখ করেনি। তদন্তকারী কর্মকর্তাও নির্যাতন ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের কথা আসামীপক্ষের জেরার জবাবে অস্বীকার করেন। দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী আসামীর প্রদত্ত ভাষায় লিখা হয়েছে। লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত জবানবন্দী দেয়ার পূর্বে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তাকে সময় দিয়েছেন। লিপিবদ্ধকারী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি.ডব্লিউ-৫৬) সাক্ষ্য প্রদান করে তা প্রমান করেছেন। উপরোক্ত সাক্ষীগনও তাদের সাক্ষ্যে বলেছেন যে, আসামী তারেক তাদের উপস্থিতিতে সংঘটিত ঘটনার কথা স্বীকার করেছে। এক্ষেত্রে আবারো নওশের আলী-বনাম-রাষ্ট্র, ৩৯ ডি.এল.আর (আপীল বিভাগ)এর ১৯৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মামলার নজির উল্লেখ করা যেতে পারে যা নিম্নরুপ:

> *"As to the judicial confession made before the Magistrate, P.W.1, the only contention about it is that it was not recorded in the words of the prisoner. This statement contains some words which are not expected of an almost illiterate person like accused Nausher, such as সুস্থ্য মন, সুস্থ্য দেহ, বাসর ঘর, আত্মগোপন, Mr. Serajul Huq contends that these are the Magistrate's words and that the statement has been couched in fine Bengali and consequently the statement can hardly be attributed to the prisoner. It is true that a confessional statement should be recorded in the words of the prisoner. But it is not correct to say that the confession not recorded exactly in the prisoner's own words are inadmissible. It appears that the prisoner did not make any complaint before the magistrate (P.W.1) about any torture of mal-treatment upon him by the*

police who produced him before the court within 36 hours including the period spent on the journey. The Investigating Officer (P.W.25) who produced him before the Magistrate denied the suggestion that he had subjected the prisoner to torture or mal-treatment. The Magistrate deposed that by questioning the prisoner and giving him caution and reasonable time for reflection he was satisfied that the prisoner made the statement voluntarily. This statement is in full agreement with the oral statement of Nausher given before P.W. Toyeb Ali and others, as stated above. Even if, for the sake of argument, this judicial confession is ignored, the extra-judicial confession made within a few minutes of the incident remains unassailed."

বর্তমান মামলায়ও একই ধরনের ঘটনার অবতারনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সহযোগী আসামী মুন্সী আনিসুল ইসলাম তার দোষ ¯xKv‡iw³gjK জবানবন্দীতে উল্লেখ করে যে, ২০০০ সালের জুন মাসের শেষের দিকে কিংবা জুলাই মাসের প্রথম দিকে সে একদিন কারখানায় গিয়ে দেখে তার ভাই মুফ্তি হান্নান, ইউসুফ, মাওলানা জাকির, নুর ইসলাম, হাসান, মাহমুদ, তারেক, গাজীসহ কয়েকজন রুমের ভিতরে মিটিং করছে এবং সেখানে প্লাস্টিকের বস্তা ভর্তি কিছু মালামালও দেখতে পায়। ইউসুফ তাকে বলে এগুলো দিয়ে বোমা বানাবে। তারা তাকে বলে, দেশে মহিলা নেত্রী। তা ইসলাম সম্মত নয়। তারা তা প্রতিহত করবে। তাদের নেতা হরকাতুল জিহাদের আমীর মাওলানা ইয়াহিয়াসহ হরকাতুল জিহাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক টুঙ্গীপাড়া অথবা কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ নাশের চেষ্টা করবে। ১৯শে জুলাই ২০০০ ইং তারিখ সন্ধ্যায় সে এবং তার বন্ধুরা উপরোক্ত ঘটনার আলামত দেখতে পায়। ঐ দিন সে বাড়ী যাওয়ার পথে তাহার ভাই মুফ্তি হান্নানের

ভাড়া করা জাকিরের ঘরের ভেতর ড্রাইভার রাশেদ, হাসান, নুর ইসলাম, গাজী, মাহমুদ ও খোকনকে দেখতে পায়। বাড়ী যাওয়ার সময় তার ভাই হান্নান ও মাওলানা ইউসুফকে মোটর সাইকেলে নীল পলিথিনে মোড়ানো গাড়ীর সামনে আসতে দেখে তার সন্দেহ হয়। ইউসুফ তার কাছে গাড়ীর ভিতরে ২টি বোমা থাকার কথা স্বীকার করে। তখন তাদের পূর্ব পরিকল্পনার কথা মনে পড়ে যায়। তার জবানবন্দী থেকে এটা প্রমানিত হয় যে, আসামী তারেক তার সহযোগীদের সাথে উক্ত ঘটনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

সহযোগী আসামী মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে তারেক হাসান ওরফে ওয়াসিম আক্তার , আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে মেহেদি হাসান ওরফে গাজী খান, মুন্সী আনিসুল ইসলাম এবং সারোয়ার হোসেন তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে প্রত্যেকেই উদ্ধারকৃত বোমা ২টি তৈরীর ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে এবং কিভাবে কি উদ্দেশ্যে বোমা ২টি তৈরী করা হয়েছিল তারও বিশদ বর্ণনা দিয়েছে -যা আমরা ইতোমধ্যে তাদের প্রত্যেকের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী থেকে দেখতে পেয়েছি । উক্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীগুলো সত্য এবং স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মর্মে আগেই উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কে ১৩ বিএলসি (এডি) পৃষ্টা. ৮১ তে প্রকাশিত ইসলাম উদ্দিন বনাম রাষ্ট্র মামলার নজির উল্লেখ করা যেতে পারে -যেখানে বলা হয়েছে যে ঃ

> *" It is now the settled principle of law that judicial confession, if it is found to be true and voluntary, can form the sole basis of conviction as against the maker of the same. The High Court Division as noticed earlier found the judicial confession of the condemned prisioner true and voluntary and considering the same, the extra-judicial confession and circumstances of the case, found the condemned prisioner guilty and accordingly, imposed the sentence of death upon him."*

এ মামলার অপরাধ সংঘটনে আরো একজন আসামী গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে, আর সে হচ্ছে আসামী রাশেদ ড্রাইভার। সহযোগী আসামী তারেক ওরফে ওয়াসিম আক্তার ওরফে মারফত আলী, মেহেদী হাসান ওরফে ওয়াদুদ ওরফে গাজী খান, মুন্সী আনিসুল ইসলাম আনিস এবং সারোয়ার হোসেন প্রমুখ তাদের জবানবন্দীতে এই আসামী সংঘটিত ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার ব্যাপারে উল্লেখ করেছে। আসামী রাশেদ ড্রাইভার বোমা তৈরী করার জন্য খুলনা থেকে বোমার সরঞ্জামাদি এবং ২টি ড্রাম নিয়ে আসে। উক্ত ২টি ড্রামের ওজন প্রায় ২০ কেজি। ২টি বোমা তৈরী করার পর সে নিজে এবং সহযোগীদেরকে নিয়ে উদ্ধার হওয়া বোমা দুটি আগের দিন কোটালীপাড়াস্থ ঘটনাস্থলে নিয়ে যায় এবং সে সহ অন্যান্য আসামীগন ঘটনাস্থলে ২টি বোমা পোঁতে রাখে। উদ্দেশ্য একটাই, গত ২২/০৭/২০০০ ইং তারিখে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী কোটালীপাড়া কলেজ মাঠে জনসভায় অংশগ্রহণ করতে আসলে তাঁকে ও তার সফরসঙ্গীদেরকে ঐ বোমা বিস্ফোরনের মাধ্যমে হত্যা করা। উপরোক্ত আসামীদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর সাথে পি.ডব্লিউ-২১ কামাল হোসেন শেখ এবং পি.ডব্লিউ-২২ মুজিবুল হকের সাক্ষ্যে সমর্থন পাওয়া যায়। পি.ডব্লিউ-২১ এর সাক্ষ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, আসামী তারেক তার সহযোগীদের নিয়ে কিভাবে বোমা তৈরী এবং পোঁতার কাজে অংশগ্রহণ করেছিল গত ১৯/০৭/২০০০ ইং তারিখ দিবাগত রাতে তা তাদেরকে দেখায়। আসামী তারেক তাদের সামনে স্বীকার করে যে, গত ২২/০৭/২০০০ ইং তারিখে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী কোটালীপাড়া কলেজ মাঠের জনসভায় অংশ গ্রহণের সময় ঐ বোমা ২টি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের হত্যা করার জন্য এবং সরকারী গাড়ী-যানবাহন, হেলিকপ্টার, হেলিপ্যাডসহ সরকারী ও বেসরকারী জানমাল ধ্বংস করার জন্য সে ও তার সহযোগী মুফ্তি হান্নান, রাশেদ, আনিস, গাজী ও ইউসুফ এবং আরও কয়েকজন মিলে বোমা ২টি তৈরী করে ঘটনাস্থলে পোঁতে রেখেছিল। পি.ডব্লিউ-২২ মুজিবুল হক আসামী রাশেদ ও তার সহযোগীদের সম্পর্কে একই রকম বক্তব্য প্রদান করে বলেন যে, তারেক তাদের সামনে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। তাছাড়া পি.ডব্লিউ-১ মো: নুর হোসেন, পি.ডব্লিউ-২ বদিউজ্জামান সরদার, পি.ডব্লিউ-৩ জাকির হোসেন, পি.ডব্লিউ ৩২ আয়নাল হোসেন, পি.ডব্লিউ-৫০ ওয়াহিদুল ইসলাম হাজরা, পি.ডব্লিউ-৫৩ আতিয়ার রহমান এবং পি.ডব্লিউ-৪৯ মো: হাবিবুর রহমান গনও আসামী রাশেদ ড্রাইভার ঘটনায় জড়িত মর্মে উল্লেখ করেছেন। কাজেই আসামীদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী এবং উপরোক্ত সাক্ষীগনের

সাক্ষ্য দ্বারা প্রমানিত হয় যে, আসামী রাশেদ ড্রাইভার এ ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত ছিল।

ঘটনার পারিপাশ্বিকতা ও সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, আসামী হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া সংঘটিত ঘটনার ষড়যন্ত্রের একজন সক্রীয় সদস্য ছিল। আসামী মুফ্তি হান্নানের জবানবন্দী অনুযায়ী আসামী মাওলানা ইয়াহিয়াসহ অন্যান্য আসামীগনের উপস্থিতিতে ঘটনা সংঘটনের জন্য ষড়যন্ত্র ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়- যা আসামী মুন্সী আনিসুল ইসলামও তার জবানবন্দীতে উল্লেখ করে বলেছে যে, সে মিটিং দেখে তার সন্দেহ আরও ঘনিভূত হয়। সে মাওলানা ইউসুফকে মিটিংয়ের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে ইউসুফ মুফ্তি হান্নানকে ডাকে এবং তারা বলে যে, দেশে মহিলা নেত্রী। তা ইসলাম সম্মত নয়। তারা তা প্রতিহত করবে। তাদের হরকাতুল জিহাদের আমীর মাওলানা ইয়াহিয়া সহ হরকাতুল জিহাদের সিদ্ধান্ত হয় যে, টুঙ্গীপাড়া অথবা কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ নাশের চেষ্টা করবে। তাছাড়া আসামী খন্দকার কামাল উদ্দিন সাকের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দীতে আসামী হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া সম্পর্কে উল্লেখ করেছে। কাজেই এটা পরিষ্কারভাবে প্রমানিত যে, হাফেজ মাওলানা ইয়াহিয়া অপরাধ কর্মের সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জড়িত ছিল।

আসামী মো: ইউসুফ ওরফে মোসহাব মোড়ল ওরফে আবু মুসা হারুন ঘটনার সাথে জড়িত ছিল মর্মে সহযোগী আসামী হাফেজ মাওলানা মুফ্তি আবদুল হান্নান, মারফত আলী ওরফে তারেক ওরফে তারেক হোসেন ওরফে ওয়াসিম আক্তার, আব্দুল ওয়াদুদ ও মেহেদি হাসান ওরফে গাজী খান, মুন্সী আনিসুল ইসলাম এবং সারোয়ার হোসেন মিয়া তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে উল্লেখ রয়েছে। মুফ্তি হান্নানের দোষ স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ আছে যে, আসামী আবু মুসা ষড়যন্ত্রের একজন সদস্য। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এই আসামী উপস্থিত ছিল এবং বোমা পোঁতার পূর্বে মুফ্তি হান্নান এবং মুসা কোটালীপাড়ায় যায়। মুফ্তি হান্নানের এ কথাগুলো আসামী তারেক, গাজী খান তাদের প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে সমর্থন করে উল্লেখ করেছে যে, আসামী ইউসুফ ওরফে আবু মুসা বোমা তৈরীর ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল এবং ষড়যন্ত্র ও সিদ্ধান্তের সাথেও জড়িত ছিল। তাছাড়া আসামী মুন্সী আনিসুল ইসলাম এবং সারোয়ার হোসেন মিয়ার স্বীকারোক্তিতে দেখা যায় আসামী আবু মুসা বোমা তৈরীর পূর্বে কারখানায় মিটিং করেছিল এবং মুফ্তি হান্নানের সাথে বোমা তৈরী এবং পোঁতার বিষয়ে সরাসরিভাবে

জড়িত ছিল। পি.ডব্লিউ-২১ মো: কামাল হোসেন, পি.ডব্লিউ-২২ মুজিবুল হক এবং পি.ডব্লিউ-৪২ মো: মুরাদ হোসেন গনও এই আসামী সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন যে, আসামী তারেক তাদের সামনে স্বীকার করেছে যে, আসামী ইউসুফ ওরফে আবু মুসা বোমা তৈরী এবং বোমা পোঁতার ব্যাপারে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত ছিল। এই সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং উক্ত আসামীদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পাশাপাশি একত্রে পর্যালোচনা করলে এই আসামী ঐ ঘটনার সাথে সরাসরিভাবে সম্পৃক্তত ছিল মর্মে প্রমান পাওয়া যায়।

আসামী শেখ ফরিদ ওরফে মাওলানা শওকত ওসমান, মাওলানা আঃ রউফ ওরফে আ:রাজ্জাক ওরফে আবু ওমর, হাফেজ জাহাঙ্গীর আলম বদর, মুফ্তি শফিকুর রহমান, মাওলানা আবু বকর ওরফে হাফেজ সেলিম হাওলাদার এবং মুফ্তি আব্দুল হাই গন হরকাতুল জিহাদ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা এবং আমীর। উল্লেখ্য যে, আসামী খন্দকার কামাল উদ্দিন সাকের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার জবানবন্দীতে আসামী মাওলানা আবু বকর ওরফে হাফেজ সেলিম হাওলাদার ও মুফ্তি আব্দুল হাই সহ অন্যান্যদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সাথে জড়িত মর্মে বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। যদিও তারা বোমা তৈরী এবং বোমা পোঁতার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয় কিন্তু তারা মূল ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী এবং তারা এ মামলার অপরাধ সংঘটনের মূল হোতা (Masterminds) । তাদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাকী আসামীরা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আসামী মুফ্তি হান্নানের জবানবন্দী অনুযায়ী তারা কয়েকজন প্রথমে ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ সুপার মার্কেটের পাশের অফিসে আলোচনা সভা করে এবং মুগদাপাড়া অফিসে মুফ্তি শফিকুর রহমান, মাওলানা আ: রউফ, শেখ ফরিদ, আবু বকর, হাফেজ ইয়াহিয়া, মুফ্তি আবদুল হান্নান, মুফ্তি আবদুল হাই এবং জাহাঙ্গীর বদর গন ঘটনার বিষয়ে ষড়যন্ত্র করত: বোমা পোঁতার বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়। উক্তরুপ ষড়যন্ত্র এবং সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মুফ্তি আবদুল হান্নানের নেতৃত্বে আসামী তারেক ওরফে মারফত আলী, ইউসুফ ওরফে আবু মুসা, আসামী রাশেদ ড্রাইভার এর সক্রীয় অংশ গ্রহন এর মাধ্যমে ২টি বোমা তৈরী করা হয় এবং তা ঘটনাস্থলে পোঁতে ধংসাত্মক কাজে লিপ্ত হবার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করেছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যারা ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে তাদের সম্পর্কে কোন ব্যক্তির বা অন্য কারো সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ খুব কমই থাকে। কারণ প্রায়শই অপরাধমূলক কার্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহন থাকে না।

ষড়যন্ত্র বা পরিকল্পনা কিংবা কোন ধরনের সম্মতি ইশারা-ঈঙ্গিতেও হতে পারে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে নিরবতার মধ্য দিয়েও এ ধরনের কর্ম অথবা অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে অন্য কারো বুঝারও উপায় থাকে না। শুধুমাত্র ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তির মাধ্যমেই তা প্রকাশিত হতে পারে। এরুপ ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তির বক্তব্য সত্য হিসেবে প্রমান হলেই যথেষ্ট। তার জন্য বাড়তি সাক্ষ্যের কিংবা সমর্থনমূলক সাক্ষ্যের প্রয়োজন মূখ্য বিষয় নয়। অপরাধ সংঘটনে অপরাধীদের ষড়যন্ত্রের পরবর্তী কার্যসমূহ সাক্ষী দ্বারা প্রমানিত হলে তা সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা অযৌক্তিক নয়। বর্তমান মামলায় সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, আসামী মুফ্তি হান্নান শুধু মূল অপরাধেই অংশগ্রহণ করেনি, সে ঘটনা সংঘটনের মূল ষড়যন্ত্রের একজন সক্রিয় সদস্য ছিল। তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী সত্য এবং স্বেচ্ছায় প্রনোদিত ছিল মর্মে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে এবং সে নিজেকে জড়িয়ে বক্তব্য প্রদান করে অপরাপর আসামীদেরকেও ষড়যন্ত্র ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে এবং মূল অপরাধ সংঘটনের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। ষড়যন্ত্র করা ও উহা বাস্তবায়নে অপরাধ সংঘটন অর্থাৎ বোমা পোঁতা পর্যন্ত এ দু'য়ের মাঝখানে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। এর মধ্যে কোন স্খলন বা break of chain পরিলক্ষিত হয়নি। সুতরাং মুফতি আঃ হান্নানের প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী অপরাপর আসামীদের ক্ষেত্রে অধিক মূল্য বহন করে। তার সাথে অপর ষড়যন্ত্রকারীদের কিংবা মূল কার্য সংঘটনে অংশগ্রহনকারী অপরাধীদের এমন কোন পূর্ব শত্রুতা ছিল না -যার ফলে সে তাদের বিরুদ্ধে অহেতুক মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে তাদেরকে দোষী বানাবে। বরং অপর ষড়যন্ত্রকারীগন ও সহযোগীদের সাথে তার সখ্যতা এবং গভীর সম্পর্ক ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার মত আফগানিস্তানে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে তালেবানদের পক্ষে যুদ্ধও করেছিল। তারা যে এ ধরনের ঘটনা সংঘটন করবে তা ঘটনা সংঘটনের পূর্বেই ১৯৯৯ সনের ২৫ এপ্রিল গোপালগঞ্জ পৌর পার্কে অনুষ্ঠিত সভায় ঈঙ্গিত প্রদান করেছিল -যা এ মামলায় পি.ডব্লিউ-২৯ এর সাক্ষ্য হতে প্রমান পাওয়া যায়। এই সাক্ষী উল্লেখ করেন যে, ঐ সভায় আসামী মুন্সী হান্নানসহ প্রায় ৫০ জন বক্তব্য দেন। তারা বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ইসলামী আলেমদের বিরুদ্ধে অত্যাচার বন্ধ না হলে শেখ হাসিনার পরিনতি তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়েও ভয়াবহ হবে। বক্তব্যের সময় সভায় উপস্থিত আলেমগন শেখ হাসিনার ধ্বংস চেয়ে শ্লোগান দেয় এবং তারা সবাই ঐ দিন থেকে নিজেদেরকে তালেবান হিসেবে উল্লেখ করে। এই সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে পরবর্তী

ঘটনার অর্থাৎ বর্তমান মামলার ঘটনার একটা পরিষ্কার যোগসূত্র পরিলক্ষিত হয়।এই সাক্ষীর সাক্ষ্যকেও সমর্থনমূলক সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

১৮৭২ সনের সাক্ষ্য আইনের ১০ ধারায় অপরাধের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে -যা এ মামলায় প্রণিধানযোগ্য। পরিষ্কারভাবে বুঝার সুবিধার্থে নিম্নে এ ধারাটি হুবুহু উদ্ধৃত করা হলোঃ

> *"10. Things said or done by conspirator in reference to common design-Where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offence or an actionable wrong, anything said, done or written by any one of such persons in reference to their common intention, after the time when such intention was first entertained by any one of them, is a relevant fact as against each of the persons believed to be so conspiring, as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it."*

অর্থ্যাৎ দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একযোগে কোন অপরাধ বা নালিশযোগ্য অন্যায় কার্য করার ষড়যন্ত্র করেছে, এরুপ বিশ্বাস করার যদি কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকে, তাহলে তাদের যে কোন একজনের উক্তি, ষড়যন্ত্রের ইচ্ছাপোষণ করার পর তাদের ঐ সাধারন উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে কোন একজনের কোন কথা, কাজ বা লেখা যদি ষড়যন্ত্র বলে মনে হয়, এরুপ প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে উহা একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা, ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমান করার জন্য যেমন উহা প্রাসঙ্গিক তেমনি ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যে উক্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তা প্রমান করার জন্যও উহা প্রাসঙ্গিক।

ষড়যন্ত্র সাধারণত: অতি গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সাক্ষ্য আইনের ১০ ধারার সারমর্ম হলো, ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহনকারীগনের মধ্যে যে কোন একজন ষড়যন্ত্রকারীর মন্তব্য বা কাজ সকল ষড়যন্ত্রকারীগণের বিরুদ্ধে গ্রহণীয়। পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দূর্লভ। তাই ইহা অনুমান সিদ্ধ বা অবস্থাগত সাক্ষ্য ছাড়া প্রমান করা সম্ভব নয়। যেমন পরবর্তী কাজ, মন্তব্য, বিবৃতিসহ ব্যক্ত অন্যান্য আচরন দ্বারা উহা প্রমান করা যায়। সাক্ষ্য আইনের এ ধারাটি জনশ্রুতিমূলক সাক্ষ্যের অগ্রহনযোগ্যতার নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির একত্রে বিচার হলে একজন ষড়যন্ত্রকারীকে কারাদন্ড প্রদান করে অন্য সকলকে মুক্তি দেয়া যেতে পারে না [সূত্র ঃ (১৯০২) কেবি ৩৩৯]। ষড়যন্ত্র মূলতঃ দু'টি অবস্থার মধ্যে সীমিত। যথা: অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাজ অভিন্ন অভিপ্রায়মূলক হবে এবং উহা একটি সময়ের সাথে যুক্ত হবে যার পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যে কারও দ্বারা পূর্বোক্ত অভিপ্রায় অর্জনের প্রয়াস থাকবে [১৯৮০ ক্রিএল জে ৩৬৯]। বর্তমান মামলায় দেখা যাচ্ছে, ঘটনা সংঘটনের ঈঙ্গিত দেয়া হয়েছিল টুঙ্গিপাড়া পৌর পার্কের সভায়। পরবর্তীতে ঢাকায় মোহাম্মদপুরস্থ ও মুগদা পাড়ার অফিসে মিটিং করে ষড়যন্ত্রকারীরা চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। সেখানে তাদের উদ্দেশ্য (objective) ছিল ধবংসাত্মক কর্ম দিয়ে সরকার প্রধানকে হত্যা করা। সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি অংশ হলো দুটি বোমা ঘটনা স্থলে স্থাপন করা। মুফ্তি হান্নানের দোষ স্বীকারোক্তি অনুযায়ী বোমা দুটি পোঁতার পর মুফ্তি হান্নান ঢাকা গিয়েছিল অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র ও সিদ্ধান্তকারী নেতাদেরকে অবহিত করার জন্য এবং পরবর্তী টার্গেট fulfil করার নিমিত্তে অন্যান্য উপকরন আনার জন্য। এতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র চলমান ছিল বোমা উদ্ঘাটনের পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত। **এ প্রসঙ্গে ৬৭ ডি.এল.আর (আপীল বিভাগ) এর ৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রাষ্ট্র বনাম মোবাইল কাদের মামলায় আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। যা নিম্নরূপ ঃ**

> *"Conduct of the accused both before and after commission of offence is also relevant to prove the charge. No written or definite agreement is necessary to constitute a conspiracy-its existence being generally a matter of inference from the acts of*

the accused. It is sufficeant to constitute the offence, so far as the combination is concerned, if there is a meeting of the minds, a mutual implied understanding or tacit agreement, all the accused working together, is with a single design, for the accomplishment of the common purpose..... ”

উপরোক্ত ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র ও aÿsmwZ¡K ঘটনা সংঘটনের সিদ্ধান্তই এ মামলার মূল বিবেচ্য বিষয়। কারন তারা ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়ন করার জন্যই ২টি বোমা তৈরী করে এবং ঘটনাস্থলে পোঁতে রাখে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সফরসঙ্গীদেরকে হত্যা করা। কাজেই ষড়যন্ত্রকারী আসামীগন তাদের ঢাকাস্থ অফিসে বসে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার বাস্তবায়ন হচ্ছে বোমা ২টি স্থাপন এবং তা বিস্ফোরন ঘটানো। উক্তরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণেই অত্র মামলার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। প্রসিকিউশনের সাক্ষ্যে সহযোগী আসামী কর্তৃক এ ধরনের ষড়যন্ত্রের উক্তি বা বর্ণনা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। **এ যুক্তির স্বপক্ষে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট (২০০১) ৭ এসসিসি, পৃষ্ঠা-৫৯৬ তে প্রকাশিত ফিরোজউদ্দিন বশিরউদ্দিন গং বনাম রাষ্ট্র মামলায় অভিমত ব্যক্ত করেন যে,**

“26. Regarding admissibility of evidence, loosened standards prevail in a conspiracy trial. Contrary to the usual rule, in conspiracy prosecutions, any declaration by one conspirator, made in furtherance of a conspiracy and during its pendency, is admissible against each co-conspirator. Despite the unreliability of hearsay evidence, it is admissible in conspiracy prosecutions. Explaining this rule, Judge Hand said:

"Such declarations are admitted upon no doctrine of the law of evidence, but of the substantive law of crime. When men enter into an agreement for an unlawful end, they become ad hoc agents for one another, and have made 'a partnership in crime'. What one does pursuant to their common purpose, all do and as declarations may be such acts, they are competent against all.

27. Thus conspirators are liable on an agency theory for statements of co-conspirators, just as they are for the overt acts and crimes committed by their confreres."

এ প্রসঙ্গে (১৯৯৯)৫ এস সি সি, পৃষ্ঠা ২৫৩ তে প্রকাশিত স্টেট বনাম নলিনি (সংক্ষেপে রাজীব গান্ধী হত্যা মামলা) মামলায় ৮৯ নং অনুচ্ছেদে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন ঃ

"89.....the confession of one accused as against a co-accused to be substative evidence against the latter, and in the absence of proof to the contrary, the Designated Court would have full power to base a conviction of the co-accused upon the confession made by another accused."

আসামীর দোষ স্বীকারোক্তির সাক্ষ্যগত মূল্য এবং উহা স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ও সহ আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে (২০১৩)১৩ এস সি সি এর ১ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ইয়াকুব আব্দুল রাজ্জাক মেনন বনাম স্টেট অব মহারাষ্ট্র মামলায় ১৮০.৩ ও ১৮০.৪ নং প্যারায় ভারতের সুপ্রীম কোর্ট আরো মন্তব্য করেন এভাবে ঃ

"180.3. With regard to the use of such confession as against a co-accused, it has to be held that as a matter of caution, a general corroboration should be sought for but in cases where the court is satisfied that the probative value of such confession is such that it does not require corrorobration then it may base conviction on the basis of such confession of the co-accused without corroboration. But this is an exception to the general rule of requiring corroboration when such confession is to be used against a co-accused.

180.4. The nature of corroboration required both in regard to the use of confession agianst the maker as also in regard to the use of the same against a co-accused is of a general nature, unless the court comes to the conclusion that such corroboration should be on material facts also because of the facts of a particular case. The degree of corroboration so required is that which is necessary for a prudent man to believe in the existence of facts mentioned in the confessional statement."

উপরোক্ত নজির সমূহের আলোকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে, কতিপয় আসামী কর্তৃক একত্রে কোন অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করলে এবং তাদের মধ্যে একজন নিজেকে সহ অন্যদেরকে ঘটনার সাথে জড়িয়ে দোষ স্বীকারোক্তি করলে উক্ত

স্বীকারোক্তি তার বিরুদ্ধে যেমন মূখ্য সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তাকে সাজা দেয়া যাবে, ঠিক তেমনই তার সাথে একই মামলায় অভিযুক্ত অন্য সহ আসামীর বিরুদ্ধেও উক্ত স্বীকারোক্তি মূখ্য সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে উহার ভিত্তিতেই সহ-আসামীকে সাজা প্রদান করা যাবে এবং উক্তরূপ সাজা প্রদানের জন্য অন্য কোন সমর্থনমূলক সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। তবে শর্ত হলো, আদালতকে এমর্মে সন্তুষ্ট হতে হবে যে, উক্ত দোষ স্বীকারোক্তির এমনি সাক্ষ্যগত মূল্য রয়েছে যে উহাকে অন্য কোন সমর্থনমূলক সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হবার প্রয়োজন নেই।

এ মামলার ঘটনার ষড়যন্ত্রের সিদ্ধান্ত পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হলে সমগ্র জাতি আবারও একটি অনিশ্চিত জীবনের মধ্যে নিমজ্জিত হতো। ষড়যন্ত্রকারীদের পরিকল্পনামতে গোপালগঞ্জে মুফ্তি হান্নানের সাবান কারখানায় বিস্ফোরক সরঞ্জামাদি আনা হয়- যা আসামী মুফ্তি হান্নান ও মেহেদি হাসান ওরফে গাজী খানের স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ রয়েছে। গাজী খান তার স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করে যে, খুলনা থেকে কারখানার প্রাইভেট গাড়ীতে করে অনুমান ১ ফুট উচু ২ টি ড্রাম আনা হয়। যার ওজন অনুমান ২০ কেজি। হাসান তাকে ২টি ড্রাম নামিয়ে দিতে বললে ঐ ২টি ড্রাম সাবান কারখানার গোডাউনে রাখে। পর্দা ঘেরা রুমে বসে ইউসুফ তাতাল দিয়ে পেন্সিল ব্যাটারী সংযোগ দিতে থাকে। ঘটনার আগের দিন নূর ইসলাম তাকে ড্রিল মেশিন পর্দার বাহির থেকে ভিতরে নিতে বললে সে ভিতরে নিয়ে ঐ ড্রামে ৩ টি ছিদ্র করে এবং বোমা প্রাইভেট কারে ওঠানোর সময় সে পাহারা দিয়েছিল। এ বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, আসামী মেহেদি হাসান ওরফে গাজী খান বোমা তৈরী ও পোঁতে রাখার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল- যা পূর্বে উল্লেখিত স্থানীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

গত ২২/০৭/২০০০ ইং তারিখে ঘটনাস্থলের পার্শ্বে লুৎফর রহমান সরকারী কলেজ মাঠে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনসভা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল- যা মুফ্তি হান্নানসহ উপরোক্ত ষড়যন্ত্রকারীগন পূর্বেই অবগত হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতি গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিত্ব ও সরকার প্রধান। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে উক্ত জনসভায় জন সমাগম এবং সফরের সময় সফরসঙ্গীদের সাথে সরকারী যানবাহনসহ হেলিকপ্টার, এ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য যানবাহন থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এমনকি ঘটনাস্থলের আশে-পাশে হেলিপ্যাড এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের অফিস, কলেজ ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ আরও গুরুত্বপূর্ন স্থাপনা রয়েছে। মামলার অভিযোগকারী বাদী পি.ডব্লিউ-১ তার সাক্ষ্যে উপরোক্ত বিষয়গুলি বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। তাকে

আসামীপক্ষ জেরা করে তার বক্তব্য খন্ডাতে পারেনি কিংবা তারা এটা অস্বীকার করেনি যে, সভা স্থলের আশে-পাশে আদৌ কোন স্থাপনা বা জনসমাগমের কোন সম্ভাবনা ছিল না। আসামীগন জব্দকৃত বোমা ২টি -যা প্রদর্শনী-২ ও ৭ হিসেবে চিহ্নিত, ঘটনাস্থলে স্থাপন করেছে সমগ্র এলাকায় ধবংসযজ্ঞ চালানোর জন্য- যাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সফরসঙ্গী ও জনসভায় অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উদ্ধারকৃত বোমা ২টি সেনাবাহিনীর উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বোমা বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। রিপোর্ট (প্রদর্শনী-১৯) অনুযায়ী উক্ত বোমাকে Improvised Explosive Devices হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ রিপোর্টের মধ্যে নিম্নরূপ উল্লেখ রয়েছে ঃ

> *"In case it ignited during the public meeting of the Hon`ble Prime Minister, the people gathered in the venue would have been killed/injured by detonation/shocked.*
>
> *However, after detail study and experiment carried out on the destructions effect of the IED, it is assumed that a radius of one km area would have been affected by this detonation, and huge loss of life and property would have taken place. A hazardous area beyond one km is assumed. It is further assumed that a cratering effect of 9'-5" depth with 34' radius on the top surface of the ground could have taken place at the site of explosive."*

উক্ত প্রতিবেদনের উক্তরূপ ব্যাখ্যা থেকে এটা স্পষ্ট যে উদ্ধারকৃত বোমা দুটি এতই শক্তিশালী ছিল যে, এ বোমা দুটির একটিও বিস্ফোরিত হলে এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধ এলাকা পর্যন্ত বিধ্বস্ত হয়ে যেতো এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাটি মানুষের মৃত্যুপুরিতে পরিনত হতো। শুধু তাই নয়, এ বোমা বিস্ফোরিত হলে ঘটনাস্থলসহ উক্ত এলাকায় ৯ ফুট

৫" মাটির গভীরে আঘাত হানত এবং মাটি হতে উক্ত ধ্বংস স্তুপ ৩৪ ফুট উপরের দিকে ধাবিত হতো।

এইরুপ ধ্বংসলীলা প্রায়শ আফগানিস্তানে সংঘটিত হয়ে থাকে-যেখানে গিয়ে মুফ্তি হান্নানসহ ষড়যন্ত্রকারীদের কেউ কেউ প্রশিক্ষন নিয়েছিল এবং তালেবানদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। সেজন্যই ষড়যন্ত্রকারী সকল আসামীগন তালেবানী কায়দায় এ ধরনের ঘটনা সংঘটনের জন্য মুফ্তি হান্নানসহ অন্যান্য আসামীদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিল। উদ্ধারকৃত বোমা ২টি পরীক্ষা করেছে সেনাবাহিনীর একটি বিশেষজ্ঞ দক্ষ দল। তাঁরা উদ্ধারকৃত বোমা দুটি পরীক্ষান্তে **Improvised Explosive Devices** হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ ২টি বোমার যে কোন একটি বিস্ফোরিত হলে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকায় স্থাপিত সরকারী এবং বেসরকারী বাস-ভবনসহ স্কুল-কলেজ ও বহু গুরুত্বপূর্ন স্থাপনাসহ আগত জনসমাগমের মারাত্বক ক্ষতি সাধিত হতো -যা বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। এতে করে মহান স্বাধীনতার স্থপতি এবং বাংলাদেশের পরিকল্পক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যসহ যারা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট ভোর রাতে বিভীষিকাময় ঘটনার মধ্য দিয়ে শহীদ হওয়ার কারণে এ সার্বভৌম দেশটি যতটুকু পিছিয়ে গিয়েছিল ঠিক আবারো অনুরুপ একটি ঘটনার অবতারনা হতো । আদতে এ দেশটি দূর্ভাগা একারণে যে, জাতির পিতাকে স্ব-পরিবারে বিনা দোষে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল ঘাতকের দল। দুনিয়ার কোন সভ্য দেশে এমনিভাবে স্বপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার ঘটনা বিরল। কাজেই এ মামলায় সংঘটিত ঘটনাকে কোনভাবেই হালকা করে দেখার অবকাশ নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরনের ভয়াবহ কর্মকান্ড আসামীগন করতে চেয়েছিল কেন?

সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং আসামীদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পূর্বে উল্লেখিত কতিপয় আসামী ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর এবং মুগদা পাড়া অফিসে মিটিং করেছিল। উক্ত মিটিং-এ তারা মতামত প্রকাশ করে যে, ‘‘আওয়ামী লীগ সরকার ইসলাম বিদ্বেষী এবং ভারতের দালাল হিসেবে ইসলাম ধ্বংসের কাজে লিপ্ত’’। সুতরাং তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তাঁর সরকারকে উৎখাত করতে হবে হত্যার মধ্য দিয়ে । কিন্তু কি ধরনের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ তৎকালীন সরকার

করেছিল বা ভারতের সাথে কি ধরনের আঁতাত করেছিল এরুপ কোন বক্তব্য দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে আসামীগন উল্লেখ করেনি।

আসামীদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একটি অবাস্তব এবং ভ্রান্ত ধারনার উপর ভিত্তি করে তাদের এ ধরনের মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল। আবার দেখা যাচ্ছে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে কেউ কেউ আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে গিয়ে বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠনে যোগদান করে বিভিন্ন ধরনের জঙ্গী কার্যকলাপের ট্রেনিং গ্রহণ করেছিল। এ ধরনের জঙ্গী তৎপরতার আড়ালে যাদের বিচরণ ছিল তাদের সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাগন তদন্তের আরো গভীরে যাওয়া উচিৎ ছিল। তদন্তকারী কর্মকর্তারা এ মামলার তদন্তে আরো অধিকতর মনোযোগি হওয়ার দরকার ছিল। অবস্থা যা হোক না কেন, আসামীগন ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সরকারকে দোষারোপ করেছিল। অথচ ইসলামের মূল্যবোধ এবং হযরত মোহাম্মদ (সা:) এর আদর্শিক দিকগুলো এদেশের মুসলিম বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এবং আগত বংশধরদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ইসলামিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শুধু তাই নয় তিনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মের ব্যাপারেও খুবই সজাগ ছিলেন। সে অগ্রযাত্রা পরবর্তীকালে আরো জুড়ালোভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। আসামীরা যাদেরকে ইসলাম বিরোধী বা বিদ্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল তাঁরা ইসলামকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার কাজে লিপ্ত। ইসলামের মূল্যবোধ সম্পর্কে আসামীদের ভ্রান্ত ধারণা এবং তাদের এহেন কর্মে পুরো দেশ ও সমাজ অশান্তিতে বিরাজমান ছিল। ইসলাম ভাল কাজের প্রসংশা করার জন্য বার বার তাগিদ দিয়েছে। **''দেশে মহিলা নেত্রী তা ইসলাম সম্মত নয়, তারা তা প্রতিহত করবে।''** আসামীদের এ ধরনের ধ্যান-ধারনা এবং শক্তি প্রদর্শন ইসলাম কোনভাবেই সমর্থন করে না। কারণ ইসলাম শান্তির ধর্ম।

Islam is a religion of peace in the fullest sense of the word. In fact, the root word of Islam is 'silm' which itself means peace. The holy Qur'an calls its way 'the path of peace'. It states that Almighty Allah abhors any disturbances of peace. So the spirit of Islam is the spirit of peace. The first verse of the Qur'an breathes the spirit of peace. Islam attaches great

importance to peace. In fact, Islam cannot afford not to be in a state of peace because all that Islam aims at-spiritual progress, intellectual development, character building, social reform, educational activities, and above all missionary work-can be achieved only in an atmosphere of peace and harmony.

Having used the holy name of Islam, the condemned prisoners, convicts and convict-appellants engaged themselves in a utopian concept. Islam does not encourage use of force in the name of religion. The way they resorted to outrageous atrocities in the name of Islam is totally prohibited in Islam.

ষড়যন্ত্রকারী আসামীরা মূলত যাকে হত্যা করার জন্য এ ঘটনার অবতারনা করেছিল তিনি তখন দেশের বৈধ সরকার প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় ছিলেন। একটি বৈধ সরকার প্রধানকে তাঁর সহযোগীদেরকেসহ হত্যার প্রচেষ্টা এবং তা বাস্তবায়ন করা কতখানি দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর তা জাতির পিতা বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পরবর্তীতে এদেশের নিরীহ স্বাধীনতাকামী জনগন উপলব্ধি করেছিল। আসামীদের এধরনের ভ্রান্ত চিন্তা এবং ধারনা এ জাতির জন্য একটি কলংকময় অধ্যায়। দেশের মানুষের কল্যাণের স্বার্থে জঙ্গীবাদ এবং জঙ্গী তৎপরতা চিরতরে এ দেশ থেকে বিলীন হওয়া প্রয়োজন।

আসামী পক্ষের দাবি, ঘটনাস্থল কোটালীপাড়া অথচ কিছু আসামীর জবানবন্দী গোপালগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশক্রমে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রেকর্ড করা হয়েছে যা আইন বহির্ভূত। কিন্তু আসামীদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী পর্যালোচনায় দেখা যায়, সংঘটিত ঘটনার মূল উৎস বা ঘটনার মূল ষড়যন্ত্র ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর এবং মুগদা পাড়ায়। উক্ত স্থানে বসে ষড়যন্ত্র ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী ঢাকার বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা রেকর্ড করাতে কোন আইনের ব্যত্যয় ঘটেনি। এ মামলার ঘটনার গুরুত্বপূর্ন অংশ হলো ‘ষড়যন্ত্র’ -যা আসামীরা ঢাকাতে সংঘটন করায় তার তদন্ত অন্য কোন স্থানে হওয়ার কথা নয়। সুতরাং এদিক থেকে চিন্তা করলে তদন্তে কোন অনিয়ম আছে বলে মনে হয় না। এছাড়া ফৌজদারী কার্যবিধির

১৬৪ ধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে *"It is not necessary that the Magistrate receiving and recording a confession or statement should be Magistrate having jurisdiction in the case"*. সুতরাং ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আসামীদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করার ফলে উহা আইন সিদ্ধ হয়নি মর্মে আসামীপক্ষের যুক্তি সঠিক নয় এবং তাতে গোপালগঞ্জ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কি আদেশ বা নির্দেশ দিয়ে আসামীকে ঢাকায় পাঠালেন তা আমলে নেয়ার কোন কারণ নেই।

এ মামলায় আসামী মেহেদি হাসান ওরফে গাজী খান তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়ে বর্ণনা করেছে। এ আসামী অন্য আসামীদেরকেও ঘটনার সাথে জড়িত করে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছে। ষড়যন্ত্র ও সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণকারী আসামীদের সঙ্গে আসামী মুফ্তি হান্নানের ঘনিষ্টতা ও যোগাযোগ থাকার বিষয় গুলোও তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী থেকে উঠে এসেছে। মেহেদী হাসান কর্তৃক বোমা পোঁতার বিষয়ে, বোমা ছিদ্র করা এবং গাড়ীতে বোমা ওঠানোর সময় পাহারা দিয়ে ঘটনার কাজে সহায়তা করার বিষয়ে স্বীকারোক্তি রয়েছে। আসামী মুফ্তি হান্নানের সাবান কারখানার কর্মচারী আহাদ হোসেনকে এ মামলায় গ্রেফতার করার পর সে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করে। পরবর্তীতে তাকে এ মামলায় সাক্ষী হিসেবে গন্য করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করে তার সম্পৃক্ততা না পেয়ে তাকে একজন গুরুত্বপূর্ন সাক্ষী হিসেবে চার্জশীটে অন্তভূক্ত করায় আইনগত কোন ত্রুটি হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে উক্ত আহাদ হোসেন পরবর্তীতে স্ব-শরীরে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেনি। কিন্তু পি.ডব্লিউ-৫২ প্রবীর কুমার চক্রবর্তী, ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করেন। তিনি উক্ত আহাদ হোসেনের জবানবন্দী প্রমান করেন -যা প্রদর্শনী-৯ হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রদর্শনী-৯ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত আহাদ হোসেন বোমার সরঞ্জাম আনা, বোমা তৈরীতে আসামী গাজী খানসহ জড়িত ব্যক্তি ও কোটালীপাড়াস্থ ঘটনাস্থলে নেয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত ঘটনা প্রকাশ করেছে। কারখানার কর্মচারী মুরাদ হোসেন [পি.ডব্লিউ-৪২] তার সাক্ষ্যে উক্ত জবানবন্দীকে সমর্থন করে বলেন যে, মুফ্তি হান্নান, মফিজ, আনিস, গাজী, তারেক, মাহমুদ, হাসান, শাহনেওয়াজ, সাইফুল, খোকন, ইব্রাহিম আরও কয়েকজন কারখানার পেছনের রুমে থাকতো। ঘটনার পূর্বে জুলাই মাসের ১৪ অথবা ১৫ তারিখে কারখানার মালিকদেরকে ব্যস্ততার মধ্যে দেখতে পায়। ঘটনার আগের দিন একটা সাদা গাড়ীতে ভারী

জিনিষ উঠাতে সে দেখেছে। বোমা উদ্ধারের পরের দিন সকালে আসামী মুফ্তি হান্নান গেটের সামনে এসে বলে কালাম অথবা মুফ্তি হান্নান নামে কেউ খোঁজ করলে এ নামে কেউ নেই বলতে বলেছে। ঐ দিন সাইফুল, মাহমুদ, গাজী, শাহনেওয়াজ সবাই চলে গিয়েছে। উক্ত সাক্ষী কাঠগড়ায় উপস্থিত মুফ্তি হান্নান, তারেক, মহিবুল্লা, রাশেদ, গাজী এদেরকে শনাক্ত করে। সুতারাং ইহা পরিষ্কার যে, আসামী মেহেদী হাসান ওরফে গাজী খান সরাসরিভাবে ঘটনার সাথে জড়িত ছিল।

যদিও আসামী মফিজ @ মহিবুল্লাহ বর্তমান মামলার ঘটনা সম্পর্কে কোন দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেনি কিন্তু অন্যান্য আসামীরা এ আসামীর জড়িত থাকার ব্যাপারে তাদের স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করেছে। আসামী মফিজ কারখানার ম্যানেজার ছিল। হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব তার ও অন্য আরেক জনের উপর ন্যস্ত ছিল। আসামী মো: আহাদ হোসেন (পরবর্তীতে সাক্ষী) তার ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দিতে উল্লেখ করে যে, সে যখন মুফ্তি হান্নানের কাছে বেতনের টাকা দাবী করে তখন বেতনের টাকা মফিজ @ মহিবুল্লাহ্র কাছ থেকে নিতে বলে। চাকুরীর শুরুতে মহিবুল্লাহ তাকে কতগুলো নিয়ম-কানুন মেনে চলতে বলেছে। যথা -(১) বাহির থেকে যারা আসে তাদের পরিচয় জানা নিষেধ। (২) তাদের বাড়ী-ঘর কোথায় জানার চেষ্টা করা যাবে না (৩) ভিতরের ঘর গুলোতে কি করা হয় তা জানা যাবে না এবং ওখানে যাওয়া যাবে না এবং (৪) সাবান রাখার রুমে ঘুমাতে হবে। ইহাতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, উক্ত সাবান কারখানায় জঙ্গি তৎপরতা চলতো যা আসামী মফিজের নখর্দপনে ছিল।

আসামী মারফত আলী @ তারেক @ তারেক হাসান @ ওয়াসিম আক্তারও তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলেছে যে, তাদের সাথে আসামী মফিজ @ মহিবুল্ল্যা থাকতো এবং সে তাদেরকে দায়িত্ব ভাগ করে দিতো। কারণ মফিজ কারখানার ম্যানেজার ছিল। পি.ডব্লিউ-৪২ মো: মুরাদ হোসেনও তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, মফিজ তাদেরকে কারখানার ভিতরে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। মফিজ তাকে কারখানার পিছনের রুমে যেতে নিষেধ করেছে। ঐ রুম মালিকের ব্যক্তিগত। সেখানে থাকতো মুফ্তি হান্নান, মফিজ, আনিছ, গাজী, তারেক, মাহমুদ, হাসান, শাহনেওয়াজ, সাইফুল, খোকন, ইব্রাহীম এবং আরো কয়েকজন। উপরোক্ত সাক্ষ্য এবং বক্তব্য পরীক্ষা করলে দেখা যায় আসামী মফিজ @ মহিবুল্ল্যা সংঘটিত ঘটনার সাথে জড়িত ছিল। সুতরাং প্রসিকিউশন কর্তৃক আনিত অভিযোগের দায় থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়ার কোন সুযোগ নেই।

তবে নথি দৃষ্টি দেখা যায়, বিগত ০৫/০২/২০০৬ ইং তারিখে আসামী মফিজ ওরফে মহিবুল্লাহকে এ মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তখন থেকে এই আসামী অদ্যবধি জেলে আটক আছে। তার অর্থ, এই আসামী ইতিমধ্যে ১৪ বৎসরের সশ্রম কারা-দন্ড ভোগ করেছে। বিচারিক আদালত তাকে অত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো এক বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন। সুতরাং জেল কোড অনুযায়ী যদি আসামী মফিজ ওরফে মহিবুল্লাহ তার উপর প্রদত্ত দন্ড ইতোমধ্যে ভোগ করে থাকেন, তবে তাকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলো যদি না তার বিরুদ্ধে অন্য কোন মামলায় সম্পৃক্ততা থাকে।

আসামী মো: আনিসুল ইসলাম ওরফে আনিস তার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে নিজেকে ঘটনার সাথে সরাসরিভাবে জড়িত না করে বক্তব্য দিয়েছে। সে উল্লেখ করেছে যে, বোমা তৈরীর স্থান সাবান ফ্যাক্টরীর প্লটের মালিক সে নিজে। প্রায় সময় সে সাবান ফ্যাক্টরীতে গিয়ে পর্দা ঘেরা রুমে মুফ্তি ধরনের লোকদেরকে মিটিং করতে দেখেছে। তার সন্দেহ হলে ইউসুফ ও হান্নান তাকে বলে **''দেশে মহিলা নেত্রী। তা ইসলাম সম্মত নয়। আমরা তা প্রতিহত করব, তাদের হরকাতুল জিহাদ এর আমীর মাঃ ইয়াহিয়াসহ হরকাতুল জিহাদের নেতাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক টুঙ্গি পাড়া অথবা কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ নাশের চেষ্টা করবে।''** তার ভাই মুফ্তি হান্নানকে ২০০০ টাকার বিনিময়ে সে তার ভগ্নিপতি সরোয়ার হোসেনের মাধ্যমে জাকিরের ঘরটি ভাড়া করে দেয় -যাতে করে আসামীরা কোটালীপাড়া হর হামেশা যাতায়াত করতে পারে এবং বোমা স্থাপনের সময় লোকজনের সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে উক্ত ঘরে আশ্রয় নিতে পারে। শুধু তাই নয়, জুলাই/২০০০ মাসের প্রথম দিকে সাবান কারখানায় বিভিন্ন ধরনের তার ও কিছু কার্টুন সে দেখতে পায় এবং ১৯ জুলাই/২০০০ সন্ধ্যার পর থেকে কারখানার গাড়ী নং-৯৯৬১, ঢাকা-গ-এর গতিবিধি এবং আসামী রাশেদ ড্রাইভার, হান্নান, নুর ইসলাম, গাজী, মাহমুদ ও খোকনকে ভাড়া করা ঘরের ভিতর দেখতে পায় এবং মুফ্তি হান্নান ও মাঃ ইউসুফকে মটর সাইকেলে নীল পলিথিনে মোড়ানো গাড়ীর সামনে আসতে দেখে সন্দেহ হয়। তখন ইউসুফ গাড়ীটির ভিতরে থাকা ০২ (দুই)টি বোমার কথা তার কাছে স্বীকার করে। কিন্তু সে আসামীদের ভয়ে কারো নিকট কিছু বলেনি। তার এ ব্যাখ্যা কতটুকু গ্রহণীয় তা গভীরভাবে উপলব্ধি করলে বুঝা যায় যে, সে নিজেকে সংঘটিত ঘটনা থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে এবং ঘটনায় তার কোন সম্পৃক্ততা ছিল না মর্মে বুঝাতে চেয়েছে। কিন্তু

পি.ডব্লিউ-৩ মো: জাকির হোসেন তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, আনিসের নিকট ঘর ভাড়া দেয় সারোয়ার মাস্টারের মাধ্যমে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাবানের দোকান দেয়ার উদ্দেশ্যে। অথচ ভাড়া দেয়ার পর আনিসকে সাবান ব্যবসার ব্যাপারে বার বার জিজ্ঞেস করে দোকান খুলতে দেখেনি। শুধু একটি দরজা খোলা থাকতে দেখেছে। শার্টার কখনো খুলতো না। আনিসকে জিজ্ঞেস করলে সে বিভিন্ন অজুহাত দেখাতো। আনিসের ভাড়া নেয়া তার ঘরটিতে হুজুর ধরনের লোকজন আসতো। মাঝে মধ্যে সে আনিসকে একটি সাদা প্রাইভেট গাড়ী নিয়ে কোটালীপাড়ায় ঘুরাফেরা করতে দেখেছে। আনিসের কাছ থেকে জেনেছে প্রাইভেট কারটি ফ্যাক্টরীর। পি.ডব্লিউ-২১ কামাল হোসেন শেখ এবং আরো সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আসামী তারেক স্বীকার করে যে, সে, মুফ্তি আব্দুল হান্নান, রাশেদ, আনিস, গাজী ও ইউসুফ এবং আরও কয়েকজন মিলে ঐ বোমা দুটি তৈরী করেছিল এবং ঘটনাস্থলে পোঁতে রেখেছিল।

পি.ডব্লিউ-৪২ মো: মুরাদ হোসেনও আসামী আনিসের জড়িত থাকার ব্যাপারে পি.ডব্লিউ-৩ এবং ২১ এর সাক্ষ্য সমর্থন করেছে। এই সাক্ষী বলেছে, কারখানার পিছনের রুমে কয়েকজন থাকতো। তার মধ্যে মুফ্তি হান্নান, মফিজ, আনিস, গাজী, তারেক, মাহমুদ, হাসান, শাহনেওয়াজ, সাইফুল, খোকন, ইব্রাহীম এবং আরো কয়েকজন। কারখানার মালিক আনিস তাদের কাজকর্ম দেখাশুনা করতো। ১৯/৭/২০০০ ইং তারিখ রাত্রে বোমা উদ্ধারের পরদিন সবাই পালিয়ে যায়। বিকাল বেলায় থানার লোকজন এসে সাবান ফ্যাক্টরীর পিছনের রুম থেকে আলামত উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আসামী ওয়াদুদ ওরফে মেহেদী হাসান ওরফে গাজী তার প্রদত্ত দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বলেছে যে, ‘‘.....তখন আনিস বলে, এখানকার পরিস্থিতি খারাপ, পুলিশ, আর্মি এসেছে। আপনারা চলিয়া যান, তখন আমরা চলিয়া আসি।..... ’’ অর্থাৎ আসামী আনিস অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তার এড়ানোতেও সাহায্য করেছে। আসামী মারফত আলী ওরফে তারেক হোসেন ওরফে ওয়াসিম আক্তারও তার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বলে যে, ‘‘সাবান ফ্যাক্টরীতে কাজ করার সময় জানিতে পারি আবুল কালাম কারখানার মালিক এবং আনিস কারখানার জমির মালিক। আনিস মাঝে মাঝে কারখানায় আসিত। আমাদের সাথে কথা বলিত।’’

উপরোক্ত সাক্ষীগনের সাক্ষ্য এবং আসামীদের জবানবন্দী পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, আসামী আনিসুল ইসলাম আনিস ঘটনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

আসামী সারোয়ার হোসেন পেশায় একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। সে তার জবানবন্দীতে নিজেকে সম্পৃক্ত করে কোন বক্তব্য দেয়নি। শুধু বলেছে, আসামী আনিসুল ইসলামের অনুরোধে পি.ডব্লিউ-৩ মো: জাকিরের ঘর খানা ভাড়া করিয়ে দেয়। মুফ্তি হান্নান, সাইফুল, আনিস মাঝে মধ্যে তাদের বাড়ীতে যেতো। বোমা উদ্ঘাটনের প্রায় একমাস পূর্বে হান্নান ও রাশেদ ড্রাইভার সাদা রঙের একটি গাড়ীতে করে তাদের বাড়ীতে গিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, আসামী সারোয়ার হোসেন-আসামী মুফ্তি হান্নান ও আনিসের আত্নীয় যা সাক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত মর্মে অন্য কোন আসামী কোন বক্তব্য প্রদান করেনি এবং অন্য কোন সাক্ষীও তার সম্পৃক্ততার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেনি। রাষ্ট্র পক্ষ পর্যাপ্ত সাক্ষ্য দ্বারা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়নি। অতএব, পর্যাপ্ত সাক্ষ্যের অভাবে এই আসামী সারোয়ার হোসেন অত্র মামলার দায় হতে খালাস পেতে পারে।

বিচারিক আদালত ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ১৫(১)(এ)(বি)(সি) এবং ২৫ডি ধারায় আসামীদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদান করেছেন। এ আইনের ১৫ ধারায় সংঘটিত অপরাধের একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের ঘটনা সাধারনত এদেশে অহরহ সংঘটিত হয় না। সেজন্য উহার Practiceও খুব একটা চলমান নয়। কিন্তু ইহা একটি মারাত্নক ধরনের অপরাধ এতে কোন সন্দেহ নেই। এ অপরাধকে Sabotage বা Destructiveness অথবা নাশকতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিষ্কারভাবে বুঝার সুবিধার্থে নিম্নে এ ধারাটির প্রয়োজনীয় অংশটুকু উল্লেখ করা হলো ঃ

> *"15. Sabotage-(1) No person shall do any act with intent to impair the efficiency or impede the working of, or to cause damage to,*
>
> *(a) Any building, vehicle, machinery, apparatus or other property used, or intended to be used, for the*

purposes of the Government or of any local authority or nationalized commercial or industrial undertaking;

(b) Any railway, aerial, ropeway, road, canal, bridge, culvert, causeway, port, dockyard, light house, aerodrome, telegraph or telephone line or post, or television or wireless installation;

(c) Any rolling-stock of any railway or any vessel or aircraft;

(d).....

(e).....

(f).....

(2).....

(3) If any person contravenes any of the provisions of this section, he shall be punishable with death, or with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to fourteen years, and shall also be liable to fine."

উপরোক্ত ১৫(১) ধারা সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি যাতে উদ্দেশ্য মূলকভাবে কোন গুরুত্বপূর্ন সরকারী কাজে বাধা প্রদান না করে অথবা কোন ধ্বংসাত্মকমুলক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে সরকারী গুরুত্বপূর্ন স্থাপনা, জাতীয়করনকৃত বাণিজ্যিক স্থাপনা, রেলওয়ে, ব্রিজ, টেলিফোন লাইন, পোস্ট অফিস অথবা টেলিভিশন সেন্টার অথবা ওয়ারলেস স্থাপনা অথবা কোন ভেসেল অথবা এয়ারক্রাফট ধ্বংস করতে না পারে তৎমর্মে নিষেধ করা হয়েছে। যদি কেউ এ ধরনের অপরাধ সংঘটন করে তাহলে ১৫(৩) ধারা অনুযায়ী তাকে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড অথবা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ অর্থ দন্ডে দন্ডিত করার বিধান রয়েছে। আবার এ ধরনের কর্মকান্ড

সংঘটনের কাজে সহযোগিতা অথবা পৃষ্টপোষকতা করা কিংবা চেষ্টা করা মূল ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ- যা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

"25D. Penalty for attempt, etc-whoever attempts or conspires or makes preparation to commit or abets any offince punishable under this Act shall be punishable with the punishment provided for the offence."

আসামীপক্ষ যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন যে, আসামীদেরকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ডি ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে দন্ড দেয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ আসামীদের বিরুদ্ধে এ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়নি এবং রায় ঘোষনার পূর্বে এ ধারায় পুনরায় অভিযোগ গঠন না করে বিচারিক আদালতের বিচারক রায় ঘোষনা করেন- যা আইন সিদ্ধ নয়। বিচারিক আদালতের বিচারক কর্তৃক অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে শুধমাত্র Omission -এর কারণে উক্ত প্রদত্ত রায়কে অকার্যকর বা বেআইনী (invalid) হিসেবে গন্য করা যাবে না। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫৩৫ ধারায় ইহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্র বনাম মোবাইল কাদের [৬৭ ডিএলআর (আপীল বিভাগ) পৃষ্ঠা-৬] মামলায় উচ্চ আদালত পরিষ্কারভাবে নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন ঃ

> *"Though accused Mobile-Quader was not charged under sections 302/109 of the Penal Code, in view of the provisions of section 535 of the Code, we do not find any legal difficulty in finding him guilty under the section and convicting and sentencing him thereunder as there are abundance of evidence against him to warrant the conviction under the said sections. Moreso, we do not see any prejudice to be caused to accused-Mobile Quader for non-framing of charges against him under section 302/109 of the Penal Code by the Tribunal as he got all the opportunities to defend him by cross-examining the prosecution witnesses"*

নথি দৃষ্টে দেখা যায় এ মামলায় উপস্থিত আসামীগন এবং পলাতক আসামীগনের পক্ষে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত আইনজীবীসহ বিজ্ঞ আইনজীবীগন রাষ্ট্র পক্ষের সকল সাক্ষীগনকে পুংখানুপুংখ ও বিস্তারিতভাবে জেরা করেছেন। প্রত্যেকটি সাক্ষীই আসামী পক্ষের সাজেশন অগ্রাহ্য করে জেরায় উত্তর প্রদান করেছেন। কাজেই বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়কে আসামীদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ ডি ধারায় অভিযোগ গঠন না করার কারনে বাতিল বলার কোন সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না। আসামী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব আহসান দাবী করেন যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা মুফ্তি হান্নানের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর ক্ষেত্রে পি আর বি-এর ২৮৩ ধারা অনুসরণ করেন নাই। কারণ Case Diary-তে ইহার কোন নমুনা পাওয়া যায়নি। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত আসামীর জবানবন্দীর কপি তাৎক্ষনিকভাবে জেরার সময় নথিতে নাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী মূল্যহীন হয়ে পড়বে এমন কথা বলা যুক্তি সংগত নয়। কারণ উক্ত আসামীর দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আইনের সমস্ত বিধিবিধান প্রতিপালন পূর্বক রেকর্ড করেছেন। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ন সাক্ষীর জবানবন্দী Case Diary-তে না থাকলেও তার জন্য সাক্ষীর সাক্ষ্য মূল্যহীন হয়ে যাবে না। এ প্রসঙ্গে আমাদের আপীল বিভাগ ইয়াসিন রহমান বনাম রাষ্ট্র, ১৯ বিএলসি (এডি) পৃষ্ঠা-৮, মামলায় নিম্নরূপ মতামত ব্যক্ত করেনঃ

"Evidance of an otherwise credit-worthy witness cannot be discarded merely because it was not available in the statement of witness recorded under section 161 of the Code of Criminal Procedure."

আসামী পক্ষ থেকে আরো দাবি উত্থাপন করা হয়েছে যে, উপরে উল্লেখিত ২৫ডি ধারা অনুযায়ী আসামীগন কোন অপরাধ সংঘটন করে নাই। আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি যে, আসামীগন তাদের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছে যে, তারা একটি নাশকতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীসহ তাঁর সফরসঙ্গীদেরকে হত্যা করবে মর্মে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং সে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বিস্ফোরক দ্রব্যের সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করত: দুটি বোমা তৈরী করে ঘটনাস্থলে স্থাপন করেছিল। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের জন্য উক্ত আসামীগন বড় ধরনের একটা প্রস্তুতি নিয়েছিল ২টি বোমা তৈরী এবং ঐগুলো মাটির নীচে পোঁতে রাখার মধ্য দিয়ে -যাতে ধ্বংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয়।

এ ধরনের সংঘটিত অপরাধকে শুধুমাত্র চেষ্টার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গন্য করা হলে তা অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হবে। কারণ মূল উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আসামীরা তাদের লক্ষ্যের ধারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল । কাজেই বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ডি ধারাটি পুরোপুরিভাবে ষড়যন্ত্রকারী আসামীগনের উপরও সমভাবে প্রযোজ্য। উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে এবং পরবর্তীতে ঐ ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কোন অপরাধ সংঘটিত হয় সে ব্যক্তি, প্রমান সাপেক্ষে, উভয় অপরাধের জন্য দায়ী থাকবে।

However, the facts and evidence as disclosed in the case unleashed the details of a premeditated conspiracy to annihiliate the Hon'ble Prime Minister and her entourage. The heinous act planned out involved blasting heavy weight bomb to destroy important government establishments, such as, Nationalized Commercial Organizanization, Telephone Line, Post Office, Wireless House, Vessel, Aircraft, Helipad, School-Colleges and other things, at Kotalipara where the Hon'ble Prime Minister was scheduled to hold a meeting on 22.07.2000. The horrific activities of the condemn-prisioners, convicts and appellants were, without a doubt, deliberate, calculated and cold-blooded backed by persistent ferocity.

আসামীগনের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী এবং সার্বিক পর্যালাচনায় আরো দেখা যায়, উপরোক্ত আসামীগন এ দেশের প্রচলিত আইন মান্য করতে নারাজ। তারা জঙ্গী তৎপরতার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলন ঘটাতে চায়। কিন্তু তাদের এ ধরনের চিন্তা দেশের প্রচলিত আইন কখনো সমর্থন করে না। কারণ তারা সকলেই জন্মগতভাবে এ দেশেরই নাগরিক। ষড়যন্ত্র করে এবং দুটি বোমা পোঁতার মধ্য দিয়ে যে

অপরাধ তারা সংঘটিত করেছে তা ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর এবং জঘন্য। এমতাবস্থায়, কতেক কয়েদীর দীর্ঘ হাজত বাস বিবেচনায় তাদের দন্ড লঘু করার সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অপরাধীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার বিধান ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৬৮(১) ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখতে হবে [**by the neck till he is dead**] । উক্ত ধারা অনুসরণ করেই বিচারিক আদালত মৃত্যুদন্ড প্রদান করে থাকে। কিন্তু ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩৪এ ধারায় মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার দু'ধরনের বিধান সন্নিবেশিত রয়েছে। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ইচ্ছা করলে গলায় ঝুলিয়ে অথবা ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার আদেশ দিতে পারে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে একমাত্র বঙ্গ বন্ধু হত্যা মামলায় উভয় পদ্ধতির যেকোন একটি অনুসরণ করার কথা বিচারিক আদালতের বিজ্ঞ বিচারক আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু ফায়ারিং স্কোয়াডে জনগনের উপস্থিতিতে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার এধরনের বিধান ফৌজদারী কার্যবিধি আইনে না থাকায় হাইকোর্ট বিভাগ ঐ আদেশ পরিবর্তন করে শুধু দন্ডিত ব্যক্তির গলায় ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকরের আদেশ প্রদান করে [**রাষ্ট্র বনাম ফারুক রহমান এবং অন্যান্য, বিএলটি, বিশেষ সংখ্যা ২০০১, পৃষ্ঠা ৩১২**]। বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩৪এ ধারায় মৃত্যুদন্ড কার্যকরের দু'ধরনের পদ্ধতি থাকলেও বর্তমান মামলায় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক মৃত্যদন্ডে দন্ডিতদের গুলি করে মৃত্যুদন্ড কার্যকরের আদেশ দেন। এ ধরনের পদ্ধতিতে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার নজির যেহেতু খুব একটা দেখা যায় না সেক্ষেত্রে আমরা মনে করি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উভয় পদ্ধতির যে কোন একটি অনুসরণ করে তা কার্যকর করতে পারে। সুতরাং দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মৃত্যুদন্ড কার্যকর সম্পর্কিত আদেশ উক্তরুপে **পরিবর্তন [Modify]** করা হলো।

উপরোক্ত সাক্ষীগনের সাক্ষ্য তৎসহ জব্দকৃত আলামত সমূহের প্রমানাদি, আসামীগনের দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী, উচ্চ আদালতের নজির সমূহ এবং সার্বিক পর্যালোচনায় আমরা মনে করি যে, ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক তার প্রদত্ত রায়ের মাধ্যমে আসামীগনের (আসামী সরোয়ার হোসেন ব্যতীত) বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ড সহ অন্যান্য দন্ড প্রদানে কোন আইনগত ভুল করেননি।

অতএব, উপরোক্ত **ডেথরেফারেন্স নং-১১৬/২০১৭ অনুমোদিত [confirm]** হলো। সে সাথে ফৌজদারী আপীল নং-**১০০১৭/২০১৭** সঙ্গে জেল আপীল নং-**৩৯৫/২০১৭**, জেল আপীল নং-**৩৯৬/২০১৭**, জেল আপীল নং-**৩৯৭/২০১৭** এবং জেল আপীল নং-**৩৯৯/২০১৭**, ফৌজদারী আপীল নং-**১০০৬৯/২০১৭** সঙ্গে জেল আপীল নং-**৩৯৮/২০১৭**, ফৌজদারী আপীল নং-**৫২২৫/২০১৮** সঙ্গে জেল আপীল নং-**৩৬৫/২০১৭** এবং জেল আপীল নং-**৪০০/২০১৭ খারিজ [dismiss]** করা হলো।

ফৌজদারী আপীল নং ১০১৩৮/২০১৭ দন্ড প্রাপ্ত আসামী মোঃ আনিসুল ইসলাম আনিসের ক্ষেত্রে খারিজ ক্রমে দন্ডপ্রাপ্ত আসামী সরোয়ার হোসেন এর ক্ষেত্রে আংশিক ভাবে মঞ্জুর করা হলো। উক্ত আসামী অন্য কোন মামলায় আটক না থাকলে তাকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।

অত্র রায়ের অনুলিপি অতিসত্বর নিম্ন আদালতে প্রেরন করা হউক।

জনাব বিচারপতি মোঃ বদরুজ্জামান

আমি একমত।

মিজানুর রহমান/পি.ও